স্বাগতম্

প্রবোধকুমার সান্ন্যাল





বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২



তৃতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৩

চতুর্থ সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৫৬

পঞ্চম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৯

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

বেঙ্গল পাবলিশার্স,

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—

শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

'মুদ্রণী'

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দুই টাকা

১

পশ্চিম অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল সবে মাত্র প্রভাত হইতেছে। স্বামী স্ত্রী দুইজনে তাড়াতাড়ি নামিল। সঙ্গে লট্‌বহর অনেকগুলি, হাঁকাহাঁকি ছুটাছুটি করিয়া কুলিরা সেগুলি নামাইয়া লইতে লাগিল।

গত রাত্রির নিদ্রার পর এ-যেন এক নূতন জগতে উত্তীর্ণ হইয়া আসা। সমস্তই অপরিচিত,—এই ষ্টেশন্, ওই ফুলের গাছগুলি, ধূলি-সমাকীর্ণ এক্কাগাড়ীর পথ, দূরে রবিশস্যময় প্রান্তর, তাহারই দক্ষিণে বিশৃঙ্খল হিন্দুস্থানী শহর,—ইহাদের সহিত যেন নাড়ীর যোগ নাই। সত্যবতী চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিল, চলিতে ফিরিতে তাহার যেন আর পা সরিতেছে না। এই ভোরের বাতাস, এই অনামা পাখীর কচিৎ কলকণ্ঠ, ক্রমবর্ণায়মান পূর্ব দিগন্ত,—ইহাদেরও সহিত যেন তাহার আগে পরিচয় ছিল না। ঘুম হইতে উঠিয়াই যাহারা অকস্মাৎ পশ্চিম দেশে পা না ফেলিয়াছে তাহারা সত্যবতীর মনের কথা বুঝিবে না।

একটা হিন্দুস্থানী লোক কোথা হইতে আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইতেই প্রকাশ কহিল, 'যাক্ দারোয়ান এসে গেছে, আর কোন অসুবিধা নেই, ওর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে চল আমরা টাঙায় গিয়ে উঠি।'

'টাঙা, সে কি ?

গাড়ী গো গাড়ী, তুমি বুঝি কখনো টাঙায় ওঠোনি ? প্রকাশ হাসিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, 'একটা ঘোড়া আছে, আর তার পিছনে বাঁধা একখানা ফিটনের মত···কোচোয়ান্ ছাড়া তিন জন বসে, দু'জনে পিছনের সীট-এ, আর একজন···ঘোড়াটা টানে, আর গাড়ীটা চলে। এসো।'

সত্যবতী একটু আপত্তি করিয়া কহিল, 'ওই লোকটার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে যাবে, বিশ্বাসী ত?

'চুপ, শুনতে পাবে, ও যে আমারই লোক, আমার কাছেই থাকে। ওর হাতে সব ছেড়ে দিয়েই ত তোমাকে আনতে গিছলাম। বিয়ে করতেও গিছলাম ওর জিম্মায় দিয়ে। এসো।'

চলিতে চলিতে সত্যবতী কহিল, 'সবসুদ্ধ আমাদের তেরোটা মোট আছে, গিয়ে গুণে নেবো। একটিও হারালে চলবে না। আর বলে দাও, ছোড়াছুড়ি করতে গিয়ে বাক্সগুলো যেন তুবড়ে যায় না...সব নতুন, আনকোরা। কাল গাড়ী বদল করার সময় যে রকম শব্দ সাড়া করে নামাচ্ছিল, দেখেই ত চক্ষুস্থির, গুছিয়ে গুছিয়ে সব রাখতে পারলে হয়।

'বাপ রে, কী আগ্রহ তোমার ঘর গুছোবার।' বলিয়া হাসিয়া প্রকাশ তাহাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিল।

গাড়ী করিয়া চলিতে চলিতে প্রকাশ কহিল, 'কোনো অসুবিধে নেই এখানে, বেশ থাকা যাবে। ওই যে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, ওখান দিয়ে গেলে নবাবমহল পাওয়া যায়...বেশ বেড়াবার যায়গা; আর এইদিক দিয়ে গেলে গোলকনাথের পুরোনো মন্দির, একদিন আসবো, বুঝলে? দেখ্চ, কেমন ঠুনঠুন্ করে এক্কাগাড়ী চলচে?

সত্যবতী কহিল, 'দেখ দেখ, মেয়েরা কেমন তরকারীর বোঝা নিয়ে চলচে, —বাবা, কী জোর গায়ে! আবার গান ধরেচে গুনগুন্ করে, একটু লজ্জা নেই!'

প্রকাশ হাসিল, 'না, লজ্জা ওদের একটু কম, খেটে খেতে হয় কি না।'

'আমরা যেখানে থাকবো সে জায়গাটা কত দূরে?'

ঢেউ খেলানো পথে নামিয়া-উঠিযা টাঙা চলিতেছিল; প্রকাশ কহিল, 'এই ত কাছেই, এসে গেচে। দেখবে চল না একটা আড়ির ওপর কেমন আমার কোয়ার্টারটি, কী সুন্দর বাগান দিয়ে ঘেরা—একেবারে তাক্ লেগে যাবে। পাশেই আছে ইঁদারা, জলের অভাব নেই।'

সত্যবতী কহিল, 'ইঁদারা কী ?'

'কুয়ো গো, যার মধ্যে জল থাকে, বাল্‌তির আংটায় দড়ি বেঁধে...কুয়োর চেয়ে ইঁদারা কিন্তু অনেক বড় বলে দিচ্চি। দেখতে পাবে গরুতে কেমন জল টেনে তোলো।'

'গরুতে ? কেন ?—সত্যবতী স্বামীর মুখের দিকে তাকাইল।

'এ দেশে যে জল কম, বর্ষাও সামান্য, ইঁদারার জল নিয়ে চাষের কাজ চালাতে হয়।'

'নদী নেই ?'

'নদীর জল ত আর আনা চলে না, অনেক দূরে। আর পাহাড়ী নদী কি না, ঢল্ যখন নামে হাতীও ভেসে যায়; যখন শুকোয় তখন তেষ্টার জলও পাওয়া যায় না। পাহাড়ী নদী বড় বিশ্বাসঘাতক।'

সমস্তই নূতন সমস্তই অপরিচিত,—যে মাটিতে সত্যবতী মানুষ হইয়াছে সেখান হইতে নিজেকে উন্মূলিত করিয়া সে এইখানে আপনাকে রোপণ করিতে আসিল।

টাঙা আসিয়া আড়ির উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহার উপরে আর ঘোড়া গাড়ী টানিয়া তুলিতে পারিবে না। তাহারা দুইজনে নামিয়া পড়িল। তখন সকাল হইয়াছে।

পাশাপাশি তিন চারিখানা বাংলো। একটি ভদ্র হিন্দুস্থানী পরিবার ছাড়া আর সকলে বাঙালী। গাড়ীর শব্দ পাইয়া সকলেই বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, ডাক্তারবাবু সস্ত্রীক আসিয়া পৌছিয়াছেন। মেয়েরা আসিয়া হাসিয়া সত্যবতীর হাত ধরিলেন। সুন্দরী বউ বটে ডাক্তারবাবুর, কথাবার্তা শুনিয়া যতটা তাঁহারা আন্দাজ করিয়াছেন,—হ্যাঁ, তাহার চেয়ে বেশি বই কম নয়! সত্যবতীকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। সকলেরই ইচ্ছা নিজ নিজ বাড়ীতে তাহাকে লইয়া যায়। নিমন্ত্রণ করিবার ধুম পড়িয়া গেল। আদর, আপ্যায়ন, হাসি-গল্প, ঠাট্টা-তামাসা দেশের খবরাখবর কুশল প্রশ্ন,

ফুলশয্যায় কী আলাপ হইয়াছিল, ডাক্তারবাবুর বিবাহের বর্ণনা,—সত্যবতী ইহাদের চোটে একেবারে দিশেহারা হইয়া গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যে মেয়ে-মহলে পাকাপাকি মতামত স্থির হইয়া গেল, সত্যবতীর মত শান্ত আর ভদ্র বউ এখানে আর কাহারও নাই। সত্যবতীর মত সরল, নিরহঙ্কার ও সদালাপী মেয়ে অতি বিরল। সে এখানে আসিবে বলিয়া অনেকে নানা উপহার কিনিয়া আনিয়াছিল, এবার সবাই একে একে সেগুলি আনিয়া নববধূর মুখ দেখিল। কোনো মেয়ে গান শুনাইল, কেহ হারমোনিয়ম্ বাজাইল, আবার কেহ বা তাড়াতাড়ি সর্বাগ্রে নিজের ঘর হইতে চা, জল-খাবার ফলমূল আনিয়া হাজির করিল। সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড! পিসিমা আসিয়া সত্যবতীর সিঁথির পরে সিন্দুর আঁকিয়া কৌটাটি তাহার আঁচলে বাঁধিয়া দিলেন, সত্যবতী তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। হিন্দুস্থানী বউটি এবারে আসিয়া একখানি অভ্রচূর্ণ মাখানো বাসন্তী রংয়ের ওড়্না তাহার মাথার উপর ঢাকা দিয়া দিল, মেয়েরা একযোগে দিয়া উঠিল উলুধ্বনি, হাসির রোল পড়িয়া গেল। একটি ছোক্‌রা দূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সমস্তই দেখিতেছিল, এবার কোথাও কিছু না পাইয়া ঘরে গিয়া গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপাইয়া গান বাজাইয়া দিল।

এমনি করিয়াই হইল সত্যবতীর অভ্যর্থনা।

ছুটি পাইয়া এক সময়ে সে আসিয়া যখন নিজের বাসায় ঢুকিল তখন বেশ বেলা হইয়াছে। জিনিষপত্র ইতিমধ্যে প্রকাশ গুছাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সাজাইয়া রাখিতে পারে নাই। সাজাইবার ভার সত্যবতীর উপর। সত্যবতী আসিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। চারিদিকে এত কাজ থৈ থৈ করিতেছে, কি করিয়াই বা সে এত পারিবে, একা মানুষ,—সত্যবতী কোনদিকে আর কূল-কিনারা পাইল না। একবার সে স্নানের ঘর দেখিয়া আসিল, একবার ঘুরিয়া আসিল রান্নাঘরে, একবার বা খানিকক্ষণ ঘুরিয়াই বেড়াইল লইল। এমনি করিয়া সকাল গড়াইয়া গেল দুপুরের দিকে এবং দুপুর গেল অপরাহ্নে।

আজ আর কিছু হইয়া উঠিবে না, এখনই মেয়েরা আসিয়া পড়িবে, আজ তাহারই ঘরে গান-বাজনা এবং জলযোগের আয়োজন হইয়াছে; কিন্তু কাল হইতে আর ফাঁকি দিলে চলিবে না, কাল প্রভাত হইতেই সে নবোদ্যমে গৃহসজ্জায় লাগিয়া যাইবে।

সেদিন রাত্রে তাহার ঘুম আসিতে চাহিল না। বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে ঘরের দেওয়ালগুলি দেখিতে লাগিল। আসিবার সময় দেশ হইতে সে অনেকগুলি ছবি বাঁধাইয়া আনিয়াছে, কোন্ দেওয়ালে কি-কি ছবি টাঙাইলে বেশ মানানসই হইবে তাহাই সে জাগিয়া জাগিয়া দেওয়ালের দিকে চাহিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

ধীরে সুস্থে নূতন সংসার পাতিয়া বসিতেই তাহাদের কয়েকদিন কাটিয়া গেল। আসিয়াই দেশে তাহারা চিঠি দিয়াছিল এবং তাহার উত্তরও আসিযাছে। সত্যবতীর মা নাই, দরিদ্র পিতা ও মধ্যবিত্ত বড় দাদা। প্রকাশের মা আছেন, তিনজন দাদা ও একজন ছোটভাই। বিষয়-সম্পত্তি আছে, অবস্থা ভাল। শাশুড়ী এবং ভাসুরেরা চিঠিতে সত্যবতীকে আশীর্বাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। বিবাহ হইয়াছে অতি অল্পদিন মাত্র, ইহারই মধ্যে সত্যবতীর গুণপনায় ও ব্যবহারে তাঁহারা সবাই মুগ্ধ। ভাসুরদের সহিত সত্যবতী কথা কহে না বটে, কিন্তু ফুল না দেখিলেও যেমন ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়, তেমনি তাঁহারা সবাই তাহাকে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সত্যবতীর রূপ এবং চালচলন সম্বন্ধে বড় জায়েদের কিছু কিছু গোপন বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু স্বামীর সহিত সে বিদেশে আসিয়া বসবাস করিবে এই সান্ত্বনায় তাঁহাদের সে-বিদ্বেষ দিবালোকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ পায় নাই। তাঁহারাও শুভেচ্ছা ও পদধূলি দিয়া চিঠি পাঠাইয়াছেন। একটিমাত্র দেবর, সে সেই বিবাহের সময় আসিয়াছিল, বিবাহ চুকিয়া গেলেই পুনরায় সে দিল্লীর কলেজে পড়িতে গেছে, সংসার এবং সামাজিকতার বিশেষ ধার সে ধারে না, স্বপ্রতিষ্ঠ এবং স্বাবলম্বী, বয়সে সত্যবতীর চেয়ে সামান্য কিছু ছোট,—তাহার নিকট হইতে এখনও চিঠিপত্র আসে নাই।

নূতন এবং পরিচ্ছন্ন সংসার। লাল কাঁকরের একটি পথ নীচে হইতে আড়ির উপর উঠিয়া বারান্দার কোলে আসিয়া থামিয়াছে। পথের দুইধারে চারা গাছ লাগানো হইয়াছে, মাস তিনেকের মধ্যেই বড় হইয়া ফুল ধরিবে। ফলের গাছও দুই-একটা বসানো হইয়াছে, গাছ বড় হইয়া ফল ফলিতে অবশ্য দেরী লাগিবে। রান্নাঘরের কোলে যে মাটির উঠানটুকু,—আশা আছে বর্ষাকালে সেখানে মাচা বাঁধিয়া কুমড়ালতা লাগাইবে, লঙ্কা আর পাতিনেবুর গাছ বসাইবে। সত্যবতী তার এক বন্ধুকে চিঠি দিয়াছে, ঠিক সময়মত চিঠির ভিতরে করিয়া গাছেব বীজ পাঠাইবার জন্য।

বাজাব হইতে রঙীন কাপড় আনাইয়া সে জানলা ও দরজার পর্দা নিজের হাতে সেলাই কবিয়াছে, টেবিল-ক্লথেব উপর ফুল তুলিয়াছে, প্রকাশের রুমাল-গুলিতে নাম লিখিয়াছে। যে পাখাখানিতে স্বামী হাওয়া খায় তাহাতে সে লাল রঙের ঝালর বসাইয়াছে; ঘরের আসবাবপত্রগুলি পরিপাটি করিয়া সে সাজাইয়াছে, রোজ সকালে উঠিয়া সে সেগুলি নিজের হাতে ঝাড়ে মোছে; কোথায় ধুলা বালি জমিল তাহা সে খুঁজিয়া বেড়ায়। ঝি-চাকরের হাতে বাহিরের কাজকর্ম্ম, ঘরের ভিতরে আসিয়া তাহাদের কিছুই করিতে হয় না, এমন কি বিছানাগুলি পর্যন্ত সত্যবতী নিজের হাতে রৌদ্রে দিয়া আবার ঠিক সময় তুলিয়া আনে। পাড়ার লোকে দেখিয়া শুনিয়া আদব করিয়া তাহাকে ডাকে,—সোনা বৌ!

সকাল বেলা উঠিয়াই সে স্নান করিয়া প্রকাশের জন্য জলখাবার তৈরী কবিতে বসে। সে-কাজ সারিয়া সে যখন পয়সার হিসাব করিযা চাকরকে বাজার করিতে পাঠাইয়া দেয়, তখন দেখা যায় প্রকাশ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামীকে দেখিয়াই সে হাসিয়া বলে, 'আজ কিন্তু কিছুতেই মুখ ধোবার আগে চা খেতে দেবো না।'

এবং এই কথাটি নিত্য প্রভাতে তাহার একবার করিয়া বলা চাই। প্রকাশও হাসিয়া বলে, 'দাও লক্ষ্মীটি, আজকের মত খেতে দাও, তোমার দুটি পায়ে ধরি-'

এবং সে তাহার উত্তরে বলে, 'ওমা ছিঃ, কেউ শুনতে পাবে, ও কি কথা, পাপ হবে যে আমার।'

'লক্ষীর পা ছুলে বুঝি পাপ হয়?'

'আমি বুঝি লক্ষ্মী?'

'তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী, তুমি—'

'হয়েচে, হয়েচে,—এই নাও চা।' বলিয়া চায়ের পেয়ালাটি স্বামীর হাতে দিয়া সে উঠিয়া পড়ে।

একটি ব্যাগ হাতে লইয়া প্রকাশ সকালবেলা বাহির হয়। ব্যাগটির ভিতরে জিনিষপত্র গুছাইয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া সে দরজার কাছে একটি টুলের উপর রাখিয়া দেয়। বাহির হইবার সময় সেটি তুলিয়া দেয় স্বামীর হাতে। যে কাজগুলির প্রয়োজন অল্প, যেগুলি অনাবশ্যক, সেইগুলির প্রতিই যেন তাহার পক্ষপাতিত্ব বেশি। স্বামীর খুঁটিনাটি কাজ করে সে কেবল স্বামীকে খুশি করিবার জন্য নয়, নিজেই সে পরিতৃপ্ত হয়। সমস্ত তুচ্ছ এবং নগণ্য বস্তুর পরে আপন মনকে বুলাইয়া সে একটি অপরিসীম আনন্দ পায়।

ডিস্‌পেন্সরী হইতে প্রকাশ যখন ফেরে তখন এগারোটা বাজিয়া যায়। পথ দিয়া ব্যাগটি হাতে করিয়া প্রকাশ বাসায় ফিরিতেছে,—তাহার মাথার পরে রৌদ্র আগ্‌লাইয়া সত্যবতীর মনও ঘরে ফিরে আসে। প্রকাশের আসিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজকেও সে নিজের মধ্যে ফিরিয়া পায়। জুতা খুলিয়া প্রকাশ বসিলে সে ঝালর দেওয়া পাখাখানি লইয়া বাতাস করিতে থাকে, গায়ে ঠেকিয়া গেলে মাটিতে একবার সেখানি ঠুকিয়া লয়, সামান্য মিষ্টান্ন ও জল আনিয়া মুখের কাছে ধরে। একটু ঠাণ্ডা হইলে সুগন্ধী তেল, সাবান, তোয়ালে আনিয়া বলে, 'এবারে চান্ করতে যাবে ত? জলের বালতি রোদ্দুরে রেখেচি, সেই জলে চান্ ক'রো। ইঁদারার কাঁচা জলে চান করা উচিত নয়।'

অপরাহ্নের দিকে এখানকার হাসপাতালে প্রকাশের ডিউটি পড়ে।

হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে মাঠের দিকে বেড়াইতে যায়, যেদিন যায় না সেদিন সত্যবতী স্বামীর কাছে বসিয়া গান ধরে—

'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর !
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর ।
সুন্দর হে, সুন্দর ॥
আলোকে মোর চক্ষু দুটি,
মুগ্ধ হ'য়ে উঠলো ফুটি'—

তাহার সুন্দর কণ্ঠের সঙ্গীতে বাহিরে সাড়া পড়িয়া যায় । সকলেই আপন আপন বাসা ছাড়িয়া তাহার ঘরের দিকে ছুটিয়া আসে। ভিতরে ঢুকিয়া প্রকাশকে মেয়েরা বাহির করিয়া দেয়। বলে, 'এত স্ত্রৈণ হলে চলে না ডাক্তারবাবু ! বৌদি আপনার একার নয়, আমাদেরো—'

প্রকাশ পলাইয়া গিয়া বাঁচে ।

সত্যবতী গান থামায় না, সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া গাহিতে থাকে,—

'হৃদগগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর হে সুন্দর ॥'

অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া মেয়েদের উল্লাস ও কলকণ্ঠের ভিতর দিয়া সেদিনকার মত বৈঠক ভাঙে ।

*   *   *

তিনমাস না পার হইতেই একদিন এই স্বচ্ছন্দ স্রোতে বাধা পড়িল। অনাহত নদীর প্রবাহ আবর্তে আসিয়া পাক খাইল।

সরকারী কাজে শহর ছাড়িয়া প্রকাশকে এক গ্রামে কয়েকজন রোগীর চিকিৎসা করিতে যাইতে হইল। সেদিন তাহার ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়, যাইবার সময় সে বন্দোবস্ত করিয়া গেল মিষ্টার দত্তর ভগ্নি ও জ্ঞানবাবুর কন্যা আসিয়া

রাত্রে সত্যবতীর নিকটে শুইবেন। মেযেরা অতি আনন্দে রাজি হইয়া গেলেন। লোকজন ও ঔষধপত্র লইয়া প্রকাশ যথাসময়ে যাত্রা করিল।

কিন্তু পরদিন সে ফিরিতে পারিল না এবং তাহার পরদিনও তাহার পক্ষে ফিরিয়া আসা সম্ভব হইল না। চারদিন পরে সেদিন মধ্যাহ্নে ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হইয়া গাড়ী করিয়া সে বাসায় ফিরিল, সত্যবতী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে নামাইয়া আনিল। বলিল, 'এ কি চেহারা হয়েছে ? এত দেরী হলো ?'

প্রকাশ কহিল, 'ভারি বিপদ, রুগীদের অবস্থা ভাল নয়, তার ওপর দেখবার শোনবার কেউ নেই—'

'চেহারাটা একেবারে আধখানা হয়ে গেচে।'

'তা ত হবেই, খাওয়া দাওয়া নেই, ঘুম নেই, না বিশ্রাম। দেখ ত, শরীরটা আমার ভাল লাগচে না।'

তাহাকে দেখিয়া শুনিয়া সত্যবতীব কান্না পাইল। তাড়াতাড়ি কপালে হাত রাখিয়া দেখিল, বুঝিতে পারিল না ; পরে স্বামীর গলা জড়াইয়া তাহার কপালে গাল পাতিয়া কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা কবিল। হাঁ, যা ভাবিয়াছে, ঠিক তাই।

'গা যে গরম হয়েচে !'

'অ্যাঁ ? ঠিক করে দেখ দেখি ?'

সত্যবতী পুনরায় পরীক্ষা করিয়া কহিল, 'নিশ্চয় জ্বর, তাতে ভুল নেই।'

প্রকাশের মুখখানা শুকাইয়া গেল। কহিল, 'যে-ভয় করেছিলাম তাই হলো নাকি ?'

সত্যবতী ম্লান হাসিয়া কহিল, 'ভয় কি, সামান্য জ্বর, দুদিন বিশ্রাম নিলেই··· উঠে এসো, শুয়ে পড় বিছানায়, আমি দুধ জ্বাল দিয়ে আনি। আর এমন করে বাপু কোথাও যাওয়া হবে না ; শরীর বাঁচিয়ে তবে অন্য কাজ।' বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কী দুর্ভাবনা, কী অশান্তি,—যাক্ এবার সে বাঁচিল। ঘরের মানুষ ঘরে না থাকিলে ত্রিসংসার যে কী অন্ধকার মনে হয় তাহা এই চারদিনে সত্যবতী বুঝিতে

পারিয়াছে। বাস্তবিক, অনেক পরিমাণ মূল্য দিয়া তাহাকে এই যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতাটুকু কিনিতে হইল। একজনের অভাবে এই ঘরদুয়ার, এই সাজানো গৃহস্থালী কী নিরর্থক ও অসার, কী শূন্যময় ও অবসাদগ্রস্ত!

কিন্তু সন্ধ্যার দিকে প্রকাশের জ্বর যখন বাড়িতে লাগিল, সর্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করিতে লাগিল, তখন সত্যবতী ভীত হইয়া কি করিবে বুঝিতে পারিল না। সামান্য বলিয়া যে-জ্বরকে সে ও-বেলায় উপেক্ষা করিল, এ-বেলায় সে-জ্বর ত সামান্য বলিয়া দেখা গেল না? প্রকাশ কি-যেন দু-একটা অসংলগ্ন কথা বলিয়া বিছানায় পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। প্রথমেই সত্যবতী চাকরকে দিয়া পিসিমার নিকট সংবাদ পাঠাইল। পিসিমার সহিত মেয়েরা তৎক্ষণাৎ আসিয়া দাঁড়াইল, দত্ত আসিল, চৌধুরী আসিল, জ্ঞানবাবু আসিয়া প্রকাশের নাড়ী ধরিলেন। আশুবাবু বলিলেন, 'এক মিনিট দেরী করো না বিমল, এখুনি ডাক্তারের ওখানে যাও, মিশিরজিকে সঙ্গে করে আনবে।'

বিমল বিদ্যুতের বেগে চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হাসপাতালের বড় ডাক্তার মিশিরজি আসিলেন, তিনি সবই জানিতেন, আসিয়া কাছে বসিয়া কহিলেন, 'জ্বর ত দেখছি খুব, যন্ত্রনাটা হচ্ছে কোথায়?'

প্রকাশ দেখাইয়া দিল হাতের তলায়, এবং তখনই তাহার সেই হাতের তলায় স্পর্শ করিতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

ডাক্তার মাথা হেঁট করিয়া মিনিট দুই বসিয়া রহিলেন, তারপর উপস্থিত ঘরের ভিতর সকলের মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া কহিলেন, 'আপনারা এঘরে আর একটুও থাকবেন না, একজন কি দু'জন কেবল থাকুন, আমাকেও আজ থাকতে হবে, রোগটা তেমন সুবিধে নয় কিনা—আর হ্যাঁ, আপনারা কেউ এক্ষুনি গিয়ে এঁর বাড়ীতে একটা তার ক'রে দিন, খবর পেয়েই যেন তাঁরা গাড়ীতে ওঠেন্—

সবাই জিজ্ঞাসা করিল, 'এমন কি কঠিন রোগ?'

ডাক্তার বলিলেন, প্লেগের সিমটম্ কি না, তাই ভয় হচ্ছে।'

সবাই পাথর হইয়া গড়াইতে গড়াইতে ঘরের বাহিরে আসিল।

তার করিবার জন্য লোক দৌড়াইল, ঔষধপত্রের জন্য ছুটাছুটি করিতে হইল, অপারেশনের সাজ-সরঞ্জাম আসিল,—এই আকস্মিক বিপৎপাতে সবাই যেন হতচকিত হইয়া কে কি করিবে তাহা আর ঠাহর করিতে পারিল না। ম্লান ও বিবর্ণ মুখে সকলেই বাহিরের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মনে মনে বিশ্বদেবতার নিকট এই ক্ষুদ্র ও সহৃদয় পরিবারটির মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল।

রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগী যন্ত্রনায় আর্তনাদ করিতে লাগিল, সে কাতরোক্তি ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার হইতে অন্ধকারের পারে চলিয়া যাইতেছিল। ডাক্তার পাশে বসিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কোন উপায় না পাইয়া শেষরাত্রের দিকে রোগীকে অজ্ঞান করিয়া হাতের তলায় ছুরি চালাইলেন। পিসিমা কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিলেন, মেয়েরাও চক্ষু মুছিতেছিল, মিষ্টার দত্ত, চৌধুরী ও জ্ঞানবাবু রোগীর বিছানার চারিদিকে দাঁড়াইয়া,—সত্যবতী পায়ের দিকে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে।

কিন্তু নীল আকাশ হইতে অপ্রত্যাশিত অসাময়িক বজ্র নামিয়া আসিল, সেই বজ্রের ভিতর দিয়া মহাকাল শেষ লগ্নের বাঁশী বাজাইয়া দিলেন।

পরদিন অপরাহ্নে ডাক্তারের সকল চেষ্টা ও পরিশ্রম নিষ্ফল করিয়া, বহু সাধ্যসাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া স্ত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া প্রকাশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সত্যবতী নড়িল না, চীৎকার করিল না, চোখের জল ফেলিল না, কেবল নির্বাক নিষ্পন্দ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। এ-মৃত্যুর কোনো ভূমিকা নাই, সঙ্গতি নাই, কোন্ পথ দিয়া আসিল তাহাও বুঝা গেল না, কোন্ পথ দিয়া ছোঁ মারিয়া এই বলিষ্ঠকায় যুবকটির প্রাণপাখীকে লইয়া উধাও হইয়া গেল তাহাও সহসা অনুধাবন করা গেল না।

তৃতীয় দিন প্রভাতে সত্যবতীর দাদা, ভাসুর ও তাঁহার ছোট ছেলেটি যখন আসিয়া পৌছিল তখন সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘণ্টাকয়েক ধরিয়া কী ঝড়

যে বহিল তাহা সহজেই অনুমেয়। জ্ঞানবাবুর স্ত্রী ও পিসিমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমস্ত বর্ণনা করিলেন। সেবা-যত্ন ও চিকিৎসার কোন ত্রুটিই হয় নাই। এমন লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রীকে লইয়া ঘর করা যাহার ভাগ্যে লেখা নাই সে দুর্ভাগ্য সংসারে আসিয়াছিলই বা কেন? মুখাগ্নি বৌমাই করিয়াছেন, শ্রাদ্ধও তাঁহাকে করিতে হইবে। এত আয়োজন, এত আনাগোনা, এতখানি স্বপ্ন ও কল্পনা—এ সমস্তর কিছুই মূল্য নাই, আড়ালে কোথায় লুকাইয়া মৃত্যু ওৎ পাতিয়া থাকে, কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে ছুটিয়া আসিয়া যা-কিছু সব ছিনাইয়া লইয়া যায়। জীবন বড় অসহায়, বড় দুর্বল।

দাদার হাতটি হাতের মধ্যে লইয়া ভাসুরপোর গলা জড়াইয়া সত্যবতী ঘোমটার ভিতর মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সকলের চোখেই জল, কেদারবাবু ভ্রাতৃশোকে একেবারে মুহ্যমান ; এই ভাইটি ছিল তাঁহার বড় প্রিয়, পিতার মৃত্যুর পর ইহাকে তিনি কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বসিয়া বসিয়া কাঁদিবার সময় নাই, কাঁদিবার জন্য সারা জীবন পড়িয়া রহিয়াছে। কেদারবাবু বলিলেন, দেনাপাওনা চুকে গেল, এবার দেশে যেতে হবে বৌমা। একথা ত ভুলব না মা, তুমি আমাদেরই ঘরের লক্ষ্মী! ওঠো মা, সব ব্যবস্থা করে নাও, বিকেলের গাড়ী।

সত্যবতী ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের ভিতর হইতে চাবির গোছা আনিয়া ভাসুরের পায়ের কাছে রাখিল। ভাসুর তাহা ছুঁইলেন না, বলিলেন, 'চাবি তুমিই রাখো ও তোমারই মা,—বাড়ীতে চল, সেখানে যত চাবি আছে এখন থেকে সব তোমারই কাছে থাকবে। তোমার স্বামী গেল কিন্তু সন্তানরা রইল বেঁচে, আমাদের ভার এবার থেকে তোমাকেই নিতে হবে।' একটু থামিয়া গাঢ়স্বরে পুনরায় কহিলেন, ভগবান তোমার মাথা হেঁট করে দিলেন পৃথিবীর কাছে, কিন্তু আমাদের কাছে নয়—এ কথাটা জেনে রেখো মা, আজ থেকে তোমার স্থান আমাদের সকলের ওপরে।'

নরু আকুল হইয়া কাঁদিতেছিল, এবার দাদারও চোখে জল গড়াইয়া আসিল ঃ

যথাসময়ে যাত্রা। ঝি, চাকর, দারোয়ান তাহাদের পাওনা চুকাইয়া লইল। ঘর-দুয়ার তচ্‌নচ্‌ করিয়া জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা হইল, পাড়ার ছেলে-মেয়েরা আসিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। চারিদিক ছিন্ন-ভিন্ন, বিধ্বস্ত ও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, অকরুণ মৃত্যুর ফুৎকারে সব ওলটপালট হইয়া গেছে, সাজানো সংসার চুরমার হইয়াছে। আশ্‌ পাশের মহিলারা আসিয়া সত্যবতীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বিদায় দিলেন। যাইবার সময় তাহার হাতের চুড়িও তাঁহারা খুলিতে দিলেন না, শাদা ধুতিও পরিতে দিলেন না। নরুর হাত ধরিয়া সত্যবতী আড়ি হইতে নামিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। ভাসুর ও দাদা আর একখানি টাঙায় উঠিলেন। গাড়ী চলিল।

যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় সত্যবতী শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। প্রতিবেশীরা তাহার দৃষ্টি হইতে ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাহাদের বাসার ছোট উঠানটির পাশে ইঁদারার পাড়টা সহজে মিলাইতে চাহিল না। ওই ইঁদারার পাড় সে যে আপন ইচ্ছায় কাঠের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল কেন, তাহা প্রকাশ অনেকবার করিয়া জানিতে চাহিয়াও সদুত্তর পাই নাই। উত্তর দিতে গিয়া বারম্বার সে লজ্জায় পড়িয়াছে, সে কথা এখনও সে স্মরণ করিতে পারে। একদিন তাহার কোলে আসিত শিশু-সন্তান, সেই শিশু বড় হইয়া হয়তবা দুরন্ত হইত,—তাহাকে সাবধানে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই মাতৃহৃদয়ের এই উদ্বিগ্ন আয়োজন! যে-সন্তান তাহার জন্মে নাই, জন্মিতে পারিল না, যাহাকে সে নিভৃত কল্পনায় বহুবার কোলে জড়াইয়া চুম্বন করিয়াছে, আজ তাহারই ছায়া যেন সম্মুখের ওই দূর দিনান্তকালের কোলে রঙীন মেঘের মত মিলাইয়া গেল। সত্যবতীর চক্ষু দুইটি বুজিয়া আসিল।

গাড়ী ততক্ষণে ষ্টেশনের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

২

চারিটি বৎসর পরে আবার উঠিল যবনিকা।

ইতিমধ্যে ও-বাড়ীতে মারা গিয়াছেন সত্যবতীর পিতা, এ-বাড়ীতে মারা গিয়াছেন তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ী। দাদার ওখানে সত্যবতী বার কয়েক গিয়াছিল কিন্তু শ্বশুরবাড়ী আসিয়া না থাকিলে চলে না, ভাসুররা কোথাও তাহাকে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, এ বাড়ীতে তাহার অবিচলিত প্রতিষ্ঠা। জায়েরা এখন আর বিদ্বেষভাবাপন্না নহেন, হইবার কারণও নাই, বিধবা ঘরের বউ খাইবেই বা কত, ভোগ করিবেই বা কতখানি! সন্তানাদি যখন নাই তখন বিষয় সম্পত্তিরও দাবি করিতে পারিবে না। আর তা ছাড়া, বেচারা স্বামী-পুত্রহীনা হইয়া একা শ্বশুর বাড়ীতে থাকে, আচার-ব্যবহারও ভাল,—আহা, থাক্—ভালই থাকুক। জায়েরা সত্যবতীর উপর সংসার ছাড়িয়া পরম নিশ্চিন্তে ঘরে উঠিয়াছেন।

সকাল বেলা ঠাকুর-ঘর হইতে বাহির হইয়া সূর্য প্রণাম সারিয়া নীচে আসিয়া দাঁড়াইতেই বড় ভাসুরের মেয়ে শৈল আসিয়া কহিল, 'ন-খুড়িমা, নন্টুর জন্যে যে মাস্টার রাখ্‌বে বলেছিলে, তিনি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, কি বল্‌ব?'

সত্যবতী কহিল, 'আমি আর বাইরে যাব না এখন, মেজ ঠাকুরকে কথা কইতে বল, কিন্তু দশ টাকার বেশি মাসে দিতে পারব না।'

'মেজ কাকা এখনো ওঠেনি ঘুম থেকে।'

'তবে একটু ঘুরে আসতে বলে দে মা।'

শৈল পিছন ফিরিতেই সত্যবতী বলিল, 'আর নয় ত বাইরের ঘরে একটু বসতে বল্, মেজ ঠাকুর উঠে কথা বল্‌বেন। বাবারে বাবা, এ বাড়ীর সব কুম্ভকর্ণের মত ঘুম।'

'না গো ন-বৌমা, তুমি যে-বাড়িতে আছ, সে বাড়ীর লোক ছ'টার পর ঘুমোবে কোন সাহসে?' বলিতে বলিতে গলার সাড়া দিয়া হাসিতে হাসিতে যোগীন বাহির হইয়া আসিলেন। জিব কাটিয়া ঘোমটা টানিয়া সত্যবতী পলাইয়া গেল।

সকলকে ডাকিয়া চা ও জলখাবার দেওয়া তাহার সকালের নিত্য কাজ। এ কাজটি আর কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া সে ছাড়িয়া দেয় না, বাড়ীর লোকের স্বাস্থ্য ও নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি তাহার কড়া নজর। তাহার পিছনে পিছনে নরু আসিয়া ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিল, বলিল, 'ন-খুড়িমা, বাবা এই টাকা পাঠিয়ে দিলেন।'

'কিসের টাকা রে?'

'তাঁর ভাগের মাসিক টাকা, এই নাও।'

এক রাশি নোট ও টাকা লইয়া সত্যবতী আঁচলে গোরো দিয়া বাঁধিল। বেলা হইয়া যাইতেছিল, সে ডাকিল, 'ওরে কানাই, আয় বাবা, বাজারে একবার চলে যা চট করে।

কানাই ধামা লইয়া আসিয়া হাজির হইল। বাজারের ফর্দ্দ তাহাকে বুঝাইয়া টাকা হাতে দিয়া সত্যবতী কহিল, 'দেশ থেকে চিঠি এসেছে তোর, কানাই?'

কানাই ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'পেয়েছি ন-মা' ভাল নেই।'

'ভাল নেই কি রে, তবে তুই আজই চলে যা, ছুটি মঞ্জুর, গাড়ী ভাড়া যাতায়াতের কত লাগে?'

'সাড়ে চার টাকা।'—হিসাব করিয়া সে কহিল।

'বাজার থেকে তাড়াতাড়ি ঘুরে আয়, খেয়ে দেয়ে গাড়ী ধরগে যা, টাকা দেবো কিছু, ওষুধ-বিষুধ ফলমূল কিনে নিয়ে যাস্, বুঝলি?'

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া কানাই বাজারে চলিয়া গেল।

একটি ছেলে নীচে নামিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, ভাঁড়ার ঘর হইতে উঁকি মারিয়া সত্যবতী ডাকিল, 'রমেন, শোন বলি।'

ধরা পড়িয়া রমেন ভয়ে ভয়ে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যবতী কহিল, 'আজকাল তুমি বড্ড মাতব্বর হয়ে গেচ, নয়? তোমার কীর্ত্তি সব আমার কানে আসচে মনে রেখো।'

কোন অপরাধটার দিকে ন-খুড়িমা ইঙ্গিত করিতেছেন তাহা হঠাৎ বুঝিতে না পারিয়া রমেন মনে মনে তাহার পূর্ব্ব কয়েকদিনের ইতিহাসটা লইয়া তোলাপড়া করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, 'আর ত আমার ইস্কুল যেতে দেরি হয় না, ন-খুড়িমা।'

'তা হয় না, কিন্তু ক্রিকেটের বল্ কপালে লাগিয়ে এসে তুমি প্রচার করেচ, আল্‌মারির কোণ লেগে কপাল ফুলেচে, তার কী? জানো, আমি মিথ্যাবাদীকে ক্ষমা করি নে?'

ভয়ে রমেনের গলা বুজিয়া আসিল।

সত্যবতী কহিল, 'আজ থেকে তিন দিন তোমার সঙ্গে কেউ কথা বলবে না। যাও।'

এ শাস্তি যে কী ভয়ানক সে অভিজ্ঞতা রমেনের ছিল। ফস করিয়া সে আর সকলের অলক্ষ্যে একবার নিজের কান মলিয়া কহিল, 'আর কখনো হবে না ন-খুড়িমা, এবারটা—'

'আচ্ছা ভেবে দেখি, যাও পড়তে বসো গে।'

রমেন চলিয়া গেল।

এই সময় কেদারবাবু নীচে নামিতেছিলেন, সিঁড়িতে তাঁহার তালতলার চটির মৃদু শব্দ পাইয়া ঘরে বসিয়া সত্যবতী ঘোমটা টানিয়া দিল। পায়ের শব্দ পাইলেই সে এ-বাড়ীর মানুষ চিনিতে পারে। কেদারবাবু দরজার কাছে আসিয়া ভিতরে গলা বাড়াইয়া কহিলেন, 'এই যে প্রভাতেই মা অন্নপূর্ণার যথাস্থানে আবির্ভাব···তসরের কাপড় ছাড়া হয়নি, কিছু একটা পালা-পার্ব্বণ আবিষ্কার করেচ বুঝি?'

ঘোমটার ভিতরে মাথা হেঁট করিয়া হাসিয়া সত্যবতী চুপিচুপি কহিল, 'আজ ইতু পূজোর ব্রত।'

'ওই দেখলে ত, উপবাস করে থাকার বেশ একটা ছল্ খুঁজে পেয়েচ। আর ত কারো কিছু বলবার যো নেই, হিন্দুয়ানীর দোহাই পেড়ে বসবে।'

সত্যবতী তেমনি করিয়া কহিল, 'একেবারে উপবাস নয়।'

'লক্ষ্মী মা আমার,—'বলিয়া কেদারবাবু হাসিয়া চলিয়া যাইবার সময় কহিলেন, 'তুমি উপবাস করে থাকলে মনে হয় আমরাও যেন কিছু খাইনি।'

এইবার ত হাতে-নাতে ধরেচি, আর কোথায় যাবে বল ত শুনি?—' উপরের বারান্দায় বড়-বৌ প্রমুখ মেয়েদের হাসির সোরগোল শোনা গেল।

'ওমা কী ঘেন্না, ভাদ্দর বৌয়ের সঙ্গে অম্নি করে কথা কইছিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? শিগগির চোখের পাতা ছেঁড়ো বলছি।'—বড়-বৌ হাসিয়া কহিলেন!

উত্তরে কেদারবাবু হাসিলেন,—'আমি কি আর যেচে কথা বলতে গেছি বড়-বৌ? চলে যাচ্ছিলাম, উনি ডাকলেন হাতছানি দিয়ে…কি আর করি,… বাংলার মেয়েরা দেওরদের হাত করে খুসী হয় নি, এবার ভাসুরদেরও হাত করতে চায়।'

আবার হাসির শব্দ উঠিল। সবাই জানে সত্যবতী ভাসুরদের সহিত নিতান্ত প্রয়োজনে এক আধবার কথাবার্তা বলে, মেয়েরাই তাহাকে কথা বলিতে রাজি করিয়াছে। এবাড়ীর শিক্ষা-দীক্ষা উদার ও আধুনিক।

বড়দিদি, মেজ্‌দিদি, সেজদিদি স্নান করিতে এখনই একে একে নামিবেন, সত্যবতী ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের কাপড়, জামা, গামছা, তেল-সাবান, দাঁত-মাজন, বড়দিদির দাঁত খুঁটিবার কাঠি,—প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কলঘরের কাছে আলনায় আলাদা-আলাদা গুছাইয়া রাখিল। এ কাজগুলি তাহার নিত্য করা চাই। কীই-বা বাধ্য-বাধকতা, কীই-বা ঋণ,—কিন্তু ইহাতেই তাহার আনন্দ। মেয়েরা কোন্ আলোকে তাহার এই সেবাগুলি গ্রহণ করেন কে জানে, কিন্তু ভাসুররা পুরুষ মানুষ, তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষ্য করিয়া এই

কন্যাসমা তরুণীটির নিকট শ্রদ্ধায় ও স্নেহে মাথা নত করেন। ছোট হইয়া থাকিতে যে জানে, সে-ই জানে পরের হৃদয় জয় করিয়া বড় হইবার গোপন তত্ত্বটুকু। তবুও বলিব সত্যবতীর অভিসন্ধি কিছু ছিল না, সংসারে হৃদয় জয় করিবার গোপন বাসনাকে সে স্বপ্নেও প্রশ্রয় দেয় নাই,—অথচ সে এমনিই। একটা কিছুকে অবলম্বন করিতে পাইয়া তাহার নারী-হৃদয় নিরন্তর ইন্দ্রজাল বুনিতে থাকে। এই সংসারকে আপনার হাতে সৃজন করিয়া আপন স্বপ্নের মত করিয়া দেখা তাহার সকলের চেয়ে বড় সাধ।

'ন-বৌমা কোথায় গো?' এই বলিয়া একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল।—'বাজারে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম একবার হয়েই যাই বৌমার কাছ থেকে।'

ভাঁড়ার ঘর হইতে সাড়া দিয়া সত্যবতী কহিল, 'এলে বাসুর মা, আমিও ভাবছিলাম একবার খবর নেবো তোমার মেয়ের।'

মেজগিন্নি দাঁত মাজিতে মাজিতে কহিলেন, 'এইবার ন-বৌয়ের ডাক্তারি করবার পালা। যশ-কপালে মেয়ে বটে তুই ভাই, দেখে আমার হিংসে হয়।

তা বৈকি বাছা—'বাসুর মা কহিল 'ভাগ্যিমানি এসেছিল তোমাদের ঘরে তাই এত জম-জমাট। ন-বৌয়ের সুখ্যাতি নিয়েই পাড়ার লোকের দিন কাটে। এ বাছা আমার মিথ্যে কথা নয়, তোমরাও জানো। তোমাদের ন-বৌকে দেখে নিরেনব্বইটা মেয়ে লজ্জা পেয়ে যায়।

সত্যবতী হাসিয়া কহিল, 'তুমি বুঝি সকালবেলায় মেজদিদিকে ভাগবত শোনাতে এলে বাসুর মা?'

মেজঠাকুরের সাড়া পাইয়া সে মাথায় কাপড় একটু টানিয়া দিল। যোগীন বৈঠকখানার দিকে যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'কেমন লোকের ভাদ্দর-বৌ সেটা আবার দেখতে হবে ত বাসুর মা?'

'আর জ্বালিয়ো না মেজবাবু, যার গোড়া ভাল তার আগাও ভাল,

তোমাদের আবার কি বাহাদুরীটা শুনি? লেখালে পড়ালে বিস্তেই হয়,—জ্ঞানও হয় না, ভালও হয় না। যে ভাল সে আগাগোড়াই ভাল।'

'ন-বৌমা দেখচি বেশ নিজের যশের প্রোপাগ্রাণ্ডা করতে পারেন।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে যোগীন চলিয়া গেলেন। তাঁহার কথায় কিছু বিদ্রূপ, কিছু বা প্রশংসা!

লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া রুদ্ধশ্বাসে সত্যবতী কহিল, 'ছি ছি, তোমাদের জ্বালায় দেখচি দেশ ছেড়ে পালাতে হবে বাসুর মা।'

কস্তুরীর গন্ধ মা, এ কি আমাদের দোষ?—হ্যাঁ, শোনো মা মেয়ের পেটের ব্যামো সেরেচে, কিন্তু জ্বরটা এখনও ছাড়লো না, সেই নিরেনব্বই একশোয় ছুঁয়ে রয়েচে।'

'জ্বরের ওষুধ ত তোমায় দিইনি, দাঁড়াও তিনটে পুরিয়া এনে দিচ্ছি।—কানাই, এলি বাবা বাজার নিয়ে? দাঁড়া, আমি আসচি এখুনি।' বলিয়া দ্রুতপদে সত্যবতী উপরে উঠিয়া গেল।

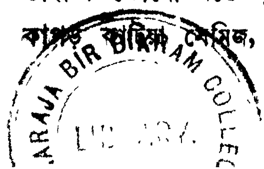
এমনি করিয়াই সকাল বেলাটা তাহার কাটিয়া যায়।

ভাসুররা এবং ছেলে-মেয়ে আপিস-ইস্কুলের সময় খাইতে বসিয়াছেন। পাতে ঘি দেওয়া, নেবু দেওয়া, জল আনিয়া দেওয়া—এ সকল কাজ সত্যবতীর। সত্যবতী আশে পাশে ঘোরাঘুরি না করিলে তাঁহাদের খাওয়া হয় না। আহারাদির পর পান, এবং মনিব্যাগে সেদিনের হাত খরচের মত পয়সা-কড়ি ভরিয়া দেওয়া,—সত্যবতী ঘরে-ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাদের টেবিলের উপর সেগুলি রাখিয়া আসে। যদি-কাপড়-চোপড় কিংবা আর কোনো জিনিষপত্র সন্ধ্যায় কিনিয়া আনিবার প্রয়োজন হয় তবে সে ফর্দ্দ লিখিয়া টাকা বেশী দিয়া মনিব্যাগটি সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দেয়।

এবং এই সবই তাহার দৈনন্দিন কর্তব্য। ছেলে মেয়েদের শিক্ষা, তাহাদের চাল-চলন, হাত-খরচ, সিনেমা ও খেলা ধুলায় যাইবার অনুমতি, ইস্কুল-কলেজের মাইনা—এসকল কেবল তাহারই হাতে। ধোপা, নাপিত, মুদি, পাওনাদার

ইদননীং তাহাকে ছাড়া বাড়ীর আর কাহাকেও চিনে না। পূজা-পার্বণ, শীতলা-ষষ্ঠি বার-ব্রত, যা কিছু হিন্দুয়ানী সমস্তই তাহার বিধি-ব্যবস্থায় চলে। বড়কর্তা সেদিন কাশী ঘুরিয়া এলেন তাহার হুকুম লইয়া, সেজকর্তা সেদিন ছেলেমেয়েদের লইয়া ফুটবল ম্যাচ্ দেখাইয়া আনিলেন তাহাকে জানাইয়া, মেজকর্তা সেদিন মেয়েদের থিয়েটার দেখাইতে লইয়া গেলেন সর্বাগ্রে তাহাকেই জানাইয়া। সত্যবতীকে তিনি যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন মেজবৌয়ের মারফৎ কিন্তু সে যাইতে রাজি হয় নাই; হাসি-তামাসা থিয়েটার-সিনেমা—ও সব সে ভালবাসে না। আমোদ আহ্লাদের নাম শুনিলেই একটা অনির্দিষ্ট আঘাতে তাহার মন দুলিয়া ওঠে, ও সব সে সহ্য করিতে পারে না। একটা মানুষ তাহার ভিতরে বিষন্ন মুখে বসিয়া থাকে।

দুপুর বেলায় পাড়ার মেয়েরা আসে। পুষ্পলতা, নবতারা, নতুন-বৌ শিবানী এবং আরও অনেকে। বৈঠক বসে সত্যবতীর খাস কামরায়। সুন্দর করিয়া সাজানো তাহার ঘর। কাঠের আসবাবগুলির পালিশে মুখ দেখা যায়। পরিচ্ছন্ন কতকগুলি ইংরেজি বাংলা বই, চিঠিপত্র লেখার সরঞ্জাম, হিসাব-পত্রের কয়েকখানি খাতা। আলমারির কাচের ভিতর দিয়া ভিতরের জামা-কাপড়গুলি দেখা যাইতেছে। দেয়ালে কয়েকখানি ছবি; কোনোখানি সমুদ্রের, কোনোটিতে একটি মন্দিরের পথ আঁকা, কোনোটি বা ঘনায়মান সন্ধ্যার। সন্ধ্যার ছায়া ম্লান চিত্রখানি বড় প্রিয়। কোনো মেয়ে আসিয়া পড়িতে বসিয়া যায়, কেউ আঁকে ছবি কেউ কার্পেটে তোলে ফুল, কেউ বা বসে সেলাই লইয়া। শিবানী হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার বইখানি মুখস্থ করিতেছে। তাহাদেরই মাঝখানে বসিয়া সত্যবতী 'সিঙ্গার' মেসিন চালাইয়া নূতন কাপড়ে জামা সেলাই করিতে থাকে। সেলাইয়ের হাত তাহার যে-কোনো নিপুণ দর্জির মতো। যাহারা দরিদ্র, পয়সা দিয়া জামা কিনিবার সঙ্গতি নাই, তাহারা কোনো মতে নূতন কাপড়ের টুকরা সংগ্রহ করিয়া আনে, সত্যবতী কাপড় কাটিয়া সেমিজ, সায়া, ব্লাউজ, ফ্রক ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দেয়।



কলিকাতার একটা রাস্তার ধারে তিন-চারজন মেয়েকে দিয়া সে একটা দর্জির দোকান প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় আছে। মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে সে সময়-সময় নানা পরামর্শ করিয়া থাকে।

'কে যেন কড়া নাড়ল বাইরে ?'

সত্যবতী কান পাতিয়া শুনিল। মিনিট দুই পরে চাকর আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইতেই সে কহিল, 'কে ডাকৃচে রে ভোলা ?'

'পিওন এসেচে ন-বৌমা।' ভোলা কহিল।

কাজ ফেলিয়া সত্যবতী উঠিয়া পড়িল। নীচে আসিয়া জানিল চিঠি নয়, তাহার সরকারী মাসোহারার টাকা আসিয়াছে।

কলম আনিয়া সই করিয়া সে টাকাগুলি গণিয়া আঁচলে বাঁধিল। যাক, আজই সে নির্মলার পড়িবার বইগুলি আনাইয়া দিতে পারিবে। বইয়ের অভাবে নির্মলার পড়াশুনা বন্ধ আছে।

এমনি করিয়া তাহার নিজের টাকাগুলি খরচ হইয়া যায়। নিজের খরচ সে নিজেই করে, কোনো কিছুর জন্য কাহারো দ্বারস্থ হইতে হয় না। স্বামীর লাইফ ইনস্যুয়রেন্সের টাকাগুলি তাহার নামে ব্যাঙ্কে রাখিয়া কেদার বাবু নিয়মিত সুদ তুলিয়া দেন। প্রতি মাসের শেষ তারিখে এই সুবৃহৎ সংসারের সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব সে কেদারবাবুর নিকট দাখিল ক'রে, কড়ায় গণ্ডায় সে একেবারে নিখুঁত। হিসাবের খাতাটিতে একবার চোখ বুলাইয়া কেদারবাবু সেটি অন্য ভাইদের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তাহা দেখিয়া তাঁহারা ন-বৌমার কৃতিত্ব ও যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। নিজের ভাগের টাকার হিসাব দিতেও সত্যবতী কুণ্ঠিত হয় না। সে-হিসাব যেমন হাস্যকর তেমনি অদ্ভুত। তাহাতে দেখা যায় বাড়ীর ছেলে-মেয়ে চাকর-বামুন হইতে আরম্ভ করিয়া ও-পাড়ার রেবতীকান্তের স্ত্রীর আঁতুড়-ঘর পর্যন্ত কেহই তাহার অর্থের ভাগ-বাটোয়ারা হইতে বাদ পড়ে নাই। বাদ পড়িয়াছে কেবল সে নিজে। চরকা কাটিয়া সূতা বিক্রয় করার যে পয়সাটা সে জমায়-

তাহারই কেবল হিসাব থাকে না, তাহা দিয়াই তাহার আবশ্যক খরচগুলি চলিয়া যায়।

রাত্রিবেলা সমস্ত সারিয়া মহাভারতখানি হাতে লইয়া সে যখন বড়ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে তখন দশটা বাজে। বড়দিদি মেঝের বিছানায় গাত্রে ঢাকা দিয়া বসিয়া ছেলেমেয়েদের হিতাহিত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন; শৈলর শীঘ্রই বিবাহ দিতে হইবে। বড়ঠাকুর তামাকের নলটা মুখে লাগাইয়া খাটের বিছানায় শুইয়া আছেন।

'এসো মা, এসো। তোমার মহাভারত পড়া না শুন্‌লে আমার ঘুমই আসতে চায় না। গায়ে একটা ঢাকা দিয়ে বসো, আজ একটু শীত বেড়েচে।'

মেঝেয় বড়দিদির পাশে বিছানায় বসিতেই বড়দিদি কহিলেন, 'জল-টল খেয়ে এসেচিস ত?'

সত্যবতী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

'কী মেয়ে বাবা, এতদিন গেল, রাতের বেলা ও আচমনি জিনিস কিছুতে ছুঁলো না কোনদিন?'

কেদারবাবু কহিলেন, 'সে কি বড়-বৌ!'

'আর বলছি কি তবে—' বড়-বৌ কহিলেন, ধনুর্ভাঙা পণ, রাতের বেলা সামান্য একটু যল কিম্বা এতটুকু মিষ্টি—তোমার ভাদ্দর-বৌটি ত কারো বাধ্য নয়!—আ মলো, চিমটি কাট্‌চিস, আমি বুঝি মিছে কথা বল্‌চি?'

কেদারবাবু বহুক্ষণ পর্যন্ত নীরব হইয়া গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'আশ্চর্য!'

সামান্য একটি কথা, কেন তিনি এই কথাটি সহসা উচ্চারণ করিলেন তাহাও সহসা বুঝা গেল না, কিন্তু কাব্যের ব্যঞ্জনাটিকে পাঠক যেমন মর্মে মর্মে অনুভব করিতে থাকে, ভাষায় ও ভঙ্গিতে যেমন তাহাকে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যায় না,—তেমনি করিয়া এ-কথাটি যেন কোন্ গভীর এবং সুদূর বেদনাকে ইঁহাদের হৃদয়ে মূর্ত করিয়া তুলিল।

মহাভারতের শান্তিপর্বটি কেদারবাবুর বড় প্রিয়, তারপরে স্বর্গারোহণ পর্বই। অনেক কষ্টে এবং অনেক বাধা কাটাইয়া ভাদ্দর-বৌ হইয়া ভাসুরের কাছে মহাভারত পড়িতে সত্যবতী অভ্যাস করিয়াছে। ভাসুর এবং বড় জা প্রায় তাহার পিতামাতার সমবয়সী।

বাহিরে অন্ধকার শীতের রাত্রি। রাজপথ ও নগরীর চক্ষু তন্দ্রায় ধীরে ধীরে মুদিয়া আসে। প্রতিবেশীগণের সাড়াশব্দ একে একে থামিয়া যায়। ইলেক্‌ট্রিকের আলো নিবাইয়া মোমবাতির কোমল স্তিমিত আলোয় বসিয়া সত্যবতী তাহার স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠে একান্ত মনে মহাভারত পড়িতে থাকে। মনে হয় সে যেন এই বর্তমান কালের সুখ-দুঃখময় সংসারে আর নাই,—এই রাত্রির অন্ধকারে তাহার গৃহমুক্ত দিশাহারা কল্পনা পৌরাণিক ভারতের পথে পথে ছুটিয়া বেড়ায়। সে কখনো দেখে রক্তপাগল কুরুক্ষেত্রের তীরে কৃষ্ণার্জুনের রথ, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভা, রাণী রুক্মিণীর ঐশ্বর্য, বিদুরের সামান্য কুটীর, অরণ্যের মধ্যে দেবী দ্রৌপদীর সুখময় সংসার, নিরপরাধিনী কুন্তী দেবীর মাতৃত্বের মহিমময় কাহিনী। তারপর একদিনে ইহলোকের লীলা শেষ করিয়া পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী চলিয়াছেন স্বর্গারোহণে, চির-তুষারময় পর্বত, দুর্গম ও বন্ধুর, তাহার শেষ নাই, আদি নাই!

সত্যবতীর বুকের রক্ত ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

ঘণ্টাখানেক পরে সে বুঝিতে পারে বড়দিদি ও বড়ঠাকুর আর জাগিয়া নাই। তখন মহাভারতখানি বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া পড়ে। বাতিটি নিবাইয়া দেয় এবং তারপর দরজাটি ধীরে ধীরে ভেজাইয়া বাহির হইয়া আসে।

সকল ঘরের দুয়ার বন্ধ। চাকর-বাকরদের আর সাড়াশব্দ নাই, সমস্ত বাড়ীটা প্রেত-পুরীর মত অন্ধকার। নিজের ঘরে ঢুকিয়া সুইচ টিপিয়া সে আলো জ্বালে। সেই সময়টা সে নিজের পড়া-শুনা লইয়া বসে। পড়িয়াছে সে অনেক। বাল্যকালে সে স্কুলে গিয়াছিল, দরিদ্র পিতা বহুকষ্টে তাহাকে কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত তুলিয়াছিলেন; এমনি সময় তাহার বিবাহ হয়।

তারপর প্রায় এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া সে বহু সাহিত্য, দর্শন, ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ গ্রন্থ, জীবনী ;—অনেক পড়িয়াছে। পড়িয়াছে সে নীরবে মুখ বুজিয়া। জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যকে কোথাও সে প্রকাশ করে নাই, কোনো তর্ক এবং আলোচনায় যোগ দেয় নাই, অহঙ্কার এবং গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে আপন ফলাফল সে প্রচার করে নাই। নিঃশব্দে নিভৃতে ও নির্বিকারে সে আপন অবকাশের মুহূর্তগুলিকে গভীর তপশ্চর্যায় ভরিয়া তুলিয়াছে। সকলের মূলেই ছিল তাহার আত্মপ্রকাশের একটি অনুপ্রেরণা। আপনাকে উজ্জ্বল করিয়া সৃজন করাটাই তাহার কাজ। নিত্য জীবনযাত্রার অন্তরালে বসিয়া হৃদয় তাহার সাধনা করিয়াছে শতদলের মত একদিন ফুটিয়া উঠিবার। বহু ভাগ্যে ও পূর্বজন্মের অপরিমিত সাধনার ফলে সে সংসারের এই বিশিষ্ট আসনটি লাভ করিয়াছে, সে-আসনের প্রান্তে স্তূপীকৃত হইয়াছে অকৃত্রিম স্নেহ, সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও দাক্ষিণ্য, যশ ও ভালবাসা। অথচ কিছুই সে চাহে নাই, সকল কাজের পিছনে জীবনের প্রতি একটি অনির্বচনীয় বৈরাগ্যকে সে অন্তরে-অন্তরে লালন করিয়া আসিয়াছে ; সংযমে, ত্যাগে, কৃচ্ছ্রসাধনায়, নিরাসক্তিতে সে-বৈরাগ্য সুশ্রী ও সুমার্জিত। এ-বৈরাগ্যকে আনিবার জন্য তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয় নাই, আপনাকে পীড়ন করিতে হয় নাই ; মোহ এবং প্রলোভনের সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হয় নাই , অত্যন্ত সহজ ও স্বভাব-সৌন্দর্যের দ্বারা সে ইহাকে লাভ করিয়াছে।

হাঁ, আত্মপ্রকাশের অনুপ্রেরণাটাই তাহার সকলের চেয়ে স্পষ্ট। এই ঘরখানির সুপরিচ্ছন্ন আসবাব, সুন্দর বিছানাগুলি, দেয়ালে টাঙানো সুশোভন চিত্র, সুবিন্যস্ত টেবল্, বাহিরের গৃহস্থালী, পরিবার-পরিজনের জীবন-নির্বাহের বিলি-ব্যবস্থা, পাড়ার লোকের সুখ-দুঃখের সহিত নিবিড় করিয়া নিজেকে জড়ানো—ইহাদের ভিতর দিয়াই সে আপনাকে অপরূপ করিয়া সৃজন করিয়াছে। কোনো মুহূর্তেই সে বসিয়া নাই, রুদ্ধ নয় তাহার অশ্রান্ত প্রবাহ ; নব নব কল্পনায়, নব নব উদ্যোগ-আয়োজনে সে অহরহ ক্রিয়াশীল। পড়া-শুনা যখন

ভাল লাগে না তখন সে নূতন কাটুনির ফ্রক্ তৈরী করার কথা ভাবে; নূতন রকমের তরকারী রাঁধাইয়া বাড়ীর সকলকে খাওয়াইবার পর সে ভাবে নূতনবৌয়ের নবজাত শিশুটির কী নামকরণ করা যায়।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসিতেছে। সংসারের হিসাব লিখিয়া শেষ করিয়া সে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়, নগরের নিদ্রিত অট্টালিকাগুলি ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কত বিচিত্র জীবন কত ইতিহাস ও কাহিনী, দুঃখ ও বেদনার কত অশ্রুবিজড়িত তথ্যে পরিপূর্ণ। সমস্ত বাড়ীগুলির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া সত্যবতী দেখিতে চাহিল, তাহার মত আর কেহ এই নিশুতি রাত্রে জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে কি না। না, কেহ নাই; কি প্রয়োজনেই বা থাকিবে! এমন বিচিত্র ও রহস্যময় মন কি কাহারো আছে যে এই নিভৃত অন্ধকারে অকারণে কেহ জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিবে? উপরে আকাশের দিকে সত্যবতী দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিল দীপ্যমান নক্ষত্রগুলির কী অপরূপ একত্র সমাবেশ! কোন্ তারাটি তাহার, কোন্‌টি সে নিজের জন্য বাছিয়া লইবে?—সেই লোকটাকে আর তাহার মনেই পড়ে না। সেই যে কী যেন নাম তাহার। হাঁ, মনে পড়িয়াছে,—প্রকাশ। প্রকাশই তাহার নাম। মুখখানা স্পষ্ট করিয়া আর মনে পড়ে না। এতই অল্প পরিচয় যে, মনে পড়িবার কথা নয়। লোকটার কী দুর্ভাগ্য! সত্যকারের জীবন যখন হইতে মানুষের সুরু হইয়া থাকে, তখনই মরণের প্রচণ্ড আঘাতে সমস্তটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেদিন দুজনে কী সুন্দর আয়োজন করিয়াছিল নূতন সংসার রচনা করিবার—স্মরণ করিতেও আজ হাসি পায়।

যাক্, সে আজ অনেক কাল হইয়া গেল। যুগ পার হইয়া আসিয়াছে যুগান্তরে, সে সকল সত্যবতীর পূর্বজন্মের কথা। আজিকার জীবনের সহিত তাহার কোনো ঐক্য নাই। যাহাদের গতি আছে, পথ আছে, প্রবাহ আছে, নিজেকে অতিক্রম করিতে যাহারা জানে—পশ্চাৎ জীবনের ইতিহাসে

তাহাদের কোনো প্রয়োজন নাই; পিছনের টানে তাহারা পিছনে ফিরিয়া তাকায় না। সত্যবতী বৃহত্তর জীবনকে স্পর্শ করিতে পাইয়াছে, ঘুচিয়া যাক্ মুছিয়া যাক্ তাহার অতীত।

জানালার নিকট হইতে সে সরিয়া আসিল।

ও-বাড়ীর ছোটপিসিমা আসিয়া খবর দিলেন কাল তাঁহার গুরুদেব আসিবেন, রামকৃষ্ণের কথা হইবে, বড়গিন্নি যেন যান। স্বামীজিকে একবার দেখিবার সাধ বড়গিন্নির অনেকদিন ধরিয়া। অনেকদিন ধরিয়া অনেক সংবাদ ও জনশ্রুতি এ-বাড়ীর সবাই শুনিয়া আসিতেছেন। স্বামীজির নানা অলৌকিক কীর্তিকলাপ, তাঁহার তপস্যা ও ধর্মবাণী, জনসেবা ও দান-ধ্যান সকলের মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাকেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার শুদ্ধি-আন্দোলন ও হিন্দুর নব-জাগরণ সম্বন্ধে প্রচার কার্য দেশের বহু সংবাদ-পত্রে উচ্চ প্রশংসিত।

পরদিন অপরাহ্নে সংবাদ পাইয়া বড়গিন্নি ও বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা চলিলেন। গায়ে একখানা চাদর জড়াইয়া সত্যবতীও চলিল তাঁহাদের পিছনে পিছনে! ছোট পিসিমার বাড়ী দূরে নয়, ভিতরে ঢুকিতেই দেখা গেল একটি ছোটখাটো আসরের মাঝখানে স্বামী আত্মানন্দ প্রশান্ত স্মিতমুখে বসিয়া আছেন, আশেপাশে পাড়ার মেয়েরা। বারান্দার উপর পাড়ার কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া বক্তৃতা শুনিতে বসিয়াছেন। সত্যবতী আসিয়াছে শুনিয়া সবাই সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল, অনেকে তাহার জন্য বিশিষ্ট আসন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন! সত্যবতীর আকর্ষণ পাড়ার কাহারো কাছে সামান্য নয়। স্বামীজির পায়ের নিকট ভক্তিভরে একটি প্রণাম করিয়া সত্যবতী বড়গিন্নির পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল। মেয়েরা অনেকেই উৎসুক হইয়া তাহাকে কুশলপ্রশ্ন করিল, অনেকেই তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও কল্যাণকামী, অনেকে আবার তাহাকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসা নিবেদন করিল। তাহার বাহিরের যশ ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া বড়গিন্নি ত অবাক্, তিনি যেন নিজে খেলো হইয়া যাইতেছিলেন।

স্বামীজি কথাবার্তা সুরু করিলেন। প্রসন্ন তাঁহার দৃষ্টি, দীপ্তশ্রী, মুণ্ডিত মস্তক, পরনে পরিচ্ছন্ন গৈরিক বাস। যাহার যাহা প্রশ্ন সকলেই একটি একটি করিয়া উত্থাপন করিতে লাগিল—সত্যবতী বসিয়া রহিল নীরবে। জীবন সম্বন্ধে যাঁহার ধ্যান ও ধারণা নিজের কাছে স্বচ্ছ হইয়া গেছে, যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁহার বাঁধে না। সত্যের বাণী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো। মুগ্ধ হইয়া সত্যবতী স্বামীজির কথাগুলি শুনিতে লাগিল। মনে হইল, এমন সহজ অভিব্যক্তি সে কোনো ধর্মগ্রন্থে, দর্শনে অথবা পুস্তকে পড়ে নাই। এমন সরল ও সাবলীল আলোচনা শ্রুতিগোচর হওয়া এই তাহার প্রথম। উপমায় অলঙ্কারে, যুক্তিতে ও প্রকাশমাধুর্যে স্বামীজির অনুপম কথালাপ একটু একটু করিয়া তাহার চেতনাকে নিবিড় করিয়া আনিল, তাহাকে গভীরের দিকে নির্দেশ করিয়া দিতে লাগিল।

'এই বয়সে দীক্ষা নেবে মা, আরো কিছুদিন গেলে হতো না? মনে হচ্ছে তুমি যেন দিন-দিন দূরে সরে যাচ্ছ ন-বৌমা।' বলিয়া কেদারবাবু একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

সত্যবতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'আমার বড় ইচ্ছে উনি চলে যাবার আগে আমাকে মন্ত্র দিয়ে যান। আপনি মত করলেই—"

'তবে ত আর দেরি করা চলে না মা।'

সত্যবতী ইতিমধ্যে পাঁজি দেখিয়া রাখিয়াছিল, কহিল, 'পরশু একটা ভালো দিন আছে।'

বড়গিন্নিও রাজি হইয়া গেলেন। অতএব শুভস্য শীঘ্রম্। এদিকে শৈলর বিবাহের পাত্র প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছে, এই ফাল্গুনেই হইবে তাহার মালা বদল। মা মারা গিয়াছেন, সত্যবতী ইতিমধ্যে দীক্ষা লইলে মায়ের কাজগুলি করিতে পারিবে। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কেদারবাবু আত্মানন্দ স্বামীকে সংবাদ পাঠাইলেন। স্বামীজির কাজই এই,—তিনি শুনিয়া বুঝিয়া আবশ্যক মতো একটি ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন। পাড়ার লোকেরা কানাকানি করিয়া শুনিতে পাইল। বাড়ীর ভিতরে পড়িয়া গেল উৎসবের আয়োজন।

ঘটা করিয়া কেদারবাবু কাজ করিবেন। এ বাড়ীতে যে চরিত্রটি সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট তাহার দীক্ষাগ্রহণ উপলক্ষ্যে দিকে-দিকে নিমন্ত্রণ-পত্র ছুটাছুটি করিতে লাগিল; আসিবে সবাই। সত্যবতীর দাদার কাছে খবর গেল, তিনি আসিলেন।

উৎসবে, আনন্দে, কোলাহলে, ভোজের পর্যাপ্ত আয়োজনে, গানে ও গল্পে একদিন কাজ শেষ হইয়া গেল। সত্যবতীর চেহারা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। আষাঢ়ের কোমল কৃষ্ণ মেঘের মতো চুলের রাশি কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে; ক্ষুর দিয়া কামাইয়া শাদা মাথাটি চক্ চক্ করিতেছে; চোখে ও মুখে একরূপ বিস্ময়কর ও স্বপ্নজড়িত মধুর হাসি, গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, পরণে গন্ধাবর্ণের একখানি তসরের থান, কপালে চন্দন ও গঙ্গামৃত্তিকার তিলক আঁকা। একেই ত রূপের খ্যাতি তাহার অসামান্য; সেই বিস্ময়কর যৌবনশ্রীর সহিত কোন একটি অনির্বচনীয় মাতৃমূর্তি মিলিয়া এবার তাহাকে অপরূপ করিয়াছে।

কিন্তু দীক্ষা লইবার পরে সত্যবতীর দৈনিক জীবনের কিছু কিছু অদল-বদল হইল। হইবারই কথা। এই পরিবারে তাহার সম্বন্ধে এমন একটি সম্ভ্রম জাগিয়া উঠিল যাহার সহিত তাহার আগেকার দিনের মিল নাই। তৃতীয়ার শীর্ণ শশীকলার মতো তাহার রহস্যময় হাসি, তাহার সংযত ও স্বল্পভাষণ, তাহার স্বেচ্ছাকৃত মুণ্ডিত মস্তক, প্রভাত-সূর্যের প্রথম রশ্মিটির মতো তাহার দেহলাবণ্য, তাহার পট্টবস্ত্রের গৌরব,—সমস্ত মিলিয়া তাহার যে মহিমা, সে মহিমার নিকট সকলের অগ্রসর হইয়া আসা অতি সঙ্কোচের কারণ হইয়া দাঁড়াইল! এই কয়েকদিন পূর্বেও এই সংসারের প্রবাহ তাহার আদেশে ও অঙ্গুলি-নির্দেশে বহিয়া চলিত, এখন সেই সংসার, সেই পরিজনবর্গ তাহার সামান্য ইচ্ছা ও অভিরুচির দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে।

আপন মহিমায় যাহারা বড় হইতে পারিয়াছে মানব-সমাজ তাহাদের নিকট স্বেচ্ছাবন্দী। সেখানে শ্বশুর-ভাসুর, ছোট ও বড়র প্রশ্ন ওঠে না।

ইহার আগে পরিবারের কুলদেবতা ছিল না, সত্যবতীর চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ঠাকুর ঘর ও শ্রীবিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু দেখা গেল সেই ঠাকুর-ঘরটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার সুচারু হস্তের সুশোভন সৃজন-বৈচিত্র্য। মূক দেবতা নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত, সেবা ও শ্রদ্ধার প্রতি তাঁহার নির্বাক বৈরাগ্য, কিন্তু তাঁহারই জন্ম খাট-বিছানা-মশারি-বালিশ, তাঁহারই জন্ম বাসন-কোসন, বিলাসের নানা সামগ্রী, গন্ধ দ্রব্য, ঝাড়-লণ্ঠন, শঙ্খ-কাঁসরঘণ্টা,—এমনিতর বহু আয়োজন। দেয়ালে টাঙানো সুন্দর ছবি, তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ রাখার ড্রয়ার, তাঁহার আয়-ব্যয়ের খাতাপত্র,—সে ঐশ্বর্য মানুষের পক্ষেও দুষ্প্রাপ্য। এমনি করিয়া ঠাকুর-ঘর যখন মুখ্য হইয়া উঠিল, নিজের ঘর হইল গৌণ। সত্যবতীর শয়নকক্ষ হইয়া আসিল ম্লান, অবহেলায় সকরুণ।

এমনি যখন অবস্থা তখন কাজকর্মের ভাগাভাগি করিয়া দিতে হইল। শৈলর হাতে সে দিল বাজারের হিসাব, নরুর হাতে দিল বালক-বালিকাদের তদ্বির করার ভার, মেজগিন্নির হাতে ছাড়িয়া দিল রান্নাবান্নার বিলি-ব্যবস্থা। সকাল বেলায় তাহার কোনোদিকে দেখাশোনা করিবার আর সময় হয় না, ঠাকুর-ঘর হইতে শেষ প্রণাম সারিয়া সে যখন বাহির হইয়া আসে তখন কর্তারা আপিস ও আদালতে বাহির হইতেছেন। কেদারবাবু ইতিমধ্যে কবে যেন হুকুম করিয়া দিয়াছেন, ন-বৌমা ঠাকুর ঘর হইতে নামিয়া নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একে একে যেন তাঁহার পায়ের ধুলা নেয়। কেবল তাই নয়, তাঁহারা কর্মস্থলে বাহির হইবার সময় ন-বৌমা একবার করিয়া যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান, তাঁহাদের যাত্রা শুভ হইবে। সত্যবতী প্রথমটা এই প্রস্তাবে সঙ্কোচে ও লজ্জায় রাঙা হইয়া আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু বড়দিদি ও মেজদিদির জন্ম তাহার সে আপত্তি টিঁকিতে পারে নাই।

দুপুর বেলাটা সকলের সহিত কাটাইয়া অপরাহ্নে আবার সে তেতলায় ঠাকুর-ঘরে উঠিয়া যায়! কত কাজ তাহার বাকি! ঘৃত দীপের সলিতা পাকানো, ধূপধুনার ব্যবস্থা করা, পুষ্পপাত্র সাজানো, নৈবেদ্য আয়োজন, পঞ্চপ্রদীপ তৈরী

করা, শ্বেত ও রক্তচন্দন ঘষা ; তারপর আছে নীচের বাগান হইতে ফুল ও বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া আনা, গঙ্গাজল দিয়া ঘর ধোয়া,—তাহার কি আলস্য করিবার সময় আছে ?—ও মা, এখনো যে স্নান করাও হয়নি !

এবং সকল কাজই একে একে সমাপ্ত করিয়া সে আবার তাহার পরিচ্ছন্ন দেবমন্দিরে ঢুকিয়া বসিয়া হাঁপ ছাড়ে। এইবার আরতির আয়োজন করিতে হইবে। অহোরাত্র বসিয়া বসিয়া ঠাকুরের আরতি করিতে পাইলে, বাস্তবিক, সংসারের সে আর কিছু চায় না।

সন্ধ্যাদীপ দিবার সময় হইলেই নিয়মমতো নীচে হইতে দিদিরা ও ছেলে মেয়েরা উপরে উঠিয়া আসে। কর্তাদের মধ্যে কেহ থাকিলে তাঁহাকেও আসিতে হয়। দেবতার আরতির সে কী বিপুল সাজ-সজ্জা। কেউ নেয় শাঁখ, কেউ কাঁসর, কেউ ঘড়ি ! ভিতরে পূজাসনে বসিয়া সত্যবতী প্রজ্জ্বলিত পঞ্চ প্রদীপটি তুলিয়া ধরে। ধূপধুনার ধোঁয়ায় ও গন্ধে ঘরখানি হয় ভরপুর, বাম হাতে তাহার বাজে মঙ্গল ঘণ্টা, মুখে কোমলকণ্ঠে স্তবপাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, সেই স্তিমিত দীপালোকিত দেবালয়ে, সেই ধূপধুনা চন্দন-পুষ্প প্রভৃতির সংমিশ্রিত গন্ধে, মন্ত্রে ও স্তব-সঙ্গীতের বিচিত্র আবহাওয়ায় একটি অখণ্ড সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টি হইয়াছে। দরজার বাহিরে বসিয়া বড়বউ, মেজবউ, সেজবউ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকেন ; ন-বউ যেন আর ন-বউ নাই—লক্ষ্মী যেন বসিয়াছেন নারায়ণের তপস্যায়।

আরতির পর প্রণাম, এবং তারপর প্রসাদ বিতরণ। পাড়ার অনেক মেয়েও আসিয়া ভক্তিভরে গলায় আঁচল দিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায়।

প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে সবাই তাকায় সত্যবতীর প্রতি। এই চারু-হাসিনী কল্যাণময়ী নারীটিকে অনেকে সহসা যেন আর চিনিতে পারে না। এ যেন সুদূর কল্পলোকের কোনো মানসী প্রতিমা। দীপ্ত যৌবন-শ্রী, চোখে নিবিড় স্বপ্নচ্ছায়া, মুখে অনির্বচনীয় আভা, কোমল কমলিকার মত দেহখানি যেন শ্রীবিষ্ণুর দুর্লভ পদ্মাসন।

বড়বউ একবার মুখ ফুটিয়া বলিবার চেষ্টা করেন, ন-বউ আমাদের মানুষ নয়, দেবী।

দেবী সত্যবতী!

৩

ছুটির বার। আহারাদির পর সকলে আপন আপন ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। কর্তারা যেদিন বাড়ীতে থাকেন পাড়ার মেয়েরা সেদিন আর আসে না, সেদিন তাহারা নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিয়াই আনন্দ পায়। মধ্যাহ্নকালের একটি মন্থর অবকাশের মধ্যে সেদিন পড়াশুনা করিয়া সত্যবতীর দিন কাটে।

দাদা আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া সত্যবতী সানন্দে সিঁড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দাদা উঠিয়া আসিতেই সে হাত ধরিয়া কহিল, 'এবার এসেচ অনেক দিন পরে। বৌদি ভাল আছেন? কোলের ছেলের কী নাম রাখলে দাদা?'

দাদা হাসিয়া কহিলেন, 'তবু ভাল যে খবর নিচ্চিস। যদি না আসতুম? চিঠি-পত্র লেখা ত ছেড়েই দিয়েচিস।'

ঘরের ভিতরে দাদাকে বসাইয়া সত্যবতী তাঁহার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইল। বলিল, 'তুমিও ত আসা কমিয়ে দিয়েচ দাদা!' একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে পুনরায় কহিল, 'বাবা নেই, মা নেই!—কই, বললে না ত ছেলের কী নাম রাখলে? আমি কি রেখেচি জানো?—বিজয়লাল।'

'বাঃ, এই ত চমৎকার নাম পাওয়া গেল। এই নামটাই নিয়ে চললুম সঙ্গে ছেলের কপালে এঁকে দেবো।'

দুজনেই হাসিতে লাগিলেন।

ঘরের ভিতরে চারিদিকে তাকাইয়া আগেকার মতো দাদা আজকে আর খুসী হইতে পারিলেন না। বলিলেন, 'এত উলু-ঢুলু কেন রে? আজকাল কী কারস?'

তাঁহার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া সত্যবতী আবার হাসিল। এবং হাসিয়া দাদার কাঁধের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া মুখ ঘষিয়া কহিল, 'গুছোবার সময় পাইনে দাদা। অনেক কাজ।'

'বটে, অনেক কাজ। কিন্তু কাজটা কী, ঠাকুর-ঘর ত? ও বেটাদের নাম শুনলেই আমার গা জ্বলে যায়।'

'চুপ কর দাদা, পাপ হবে যে।'

'হোক—' দাদা কহিলেন, 'শোবার ঘর ফেলে যারা ঠাকুর-ঘর নিয়ে ব্যস্ত, তাদের ঠাকুরকে আমি আমল দিইনে।—যাক্ কেমন আচিস বল্।'

সত্যবতী কহিল, 'ভালই, অম্‌নি চল্‌চে এক রকম।'

'ওই তোর রোগ, এমন কথা বল্‌বি যাতে তোর হদিস পাওয়া ত দূরের কথা, তোর মনেরো কূল-কিনারা পাইনে। যাবি একদিন আমাদের ওখানে?'

'তোদের ওখানে?' সত্যবতী কহিল, 'বিষ্ণুকে ফেলে ত যাওয়া চলবে না।'

দাদা চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, 'ও বাবা, এত? হায় হায়, তোকে ছাড়লে যার চলবে না তার মরণ নেই কেন?'

পিছন হইতে দাদার গলা ধরিয়া হাসিতে হাসিতে সত্যবতী ঘর ভাসাইয়া দিল। এমন করিয়া তাহাকে উচ্ছল আনন্দে হাসিতে শুনিয়া কোনো কোনো ছেলেমেয়ে আসিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইল। ও ঘরে সেজঠাকুর প্রফুল্লবাবু হাসিয়া ইন্দুবালাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ন-বৌমার হাসির শব্দ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।'

ইন্দুবালা লেখাপড়া জানা মেয়ে। কহিল, 'ও যখন ভাল মুড্-এ থাকে তখন ওকে পাওয়া একটি সৌভাগ্য। ওর কথার মালা তখন সোনার সুতোয় গাঁথা।'

বড়বউ খুসী হইয়া আসিয়া সত্যবতীর দরজায় দাঁড়াইলেন। দাদা উঠিয়া গিয়া প্রণাম করিলেন।

'বাড়ীর সব ভাল ত ভাই, ললিতা ভাল আছেন ?'

'হ্যাঁ দিদি, ভাল সব,—এই এলাম সতির দরজায় একবার মাথা ঠুকে যেতে। চিঠিপত্র ত আর দেয় না !'

বড়বউ হাসিয়া কহিলেন, 'ও যে এখন বড়গাছে নৌকা বেঁধেচে ভাই, দেবলোকে আজকাল ওর কাজকারবার। সামান্য মানুষ আমরা।'

তিনজনেই হাসিলেন।

'উনি শুয়ে শুয়ে পড়ছিলেন চৈতন্যচরিতামৃত। আমি শুন্‌ছিলাম জগাই-মাধাইয়ের মাতলামি, বেশ লাগছিল। এমন সময় বল্‌লেন, দেখে এসো ত বড়-বৌ, ন-বৌমার কানে কি শ্রীবিষ্ণুর বাণী এসে পৌছল ? এসে দেখি বিষ্ণু এসেচেন বীরেনবাবুর ছদ্মবেশে।'

হাসির রোল পড়িয়া গেল। বড়ঠাকুরের মন্তব্যটি শুনিয়া কান দুইটি সত্যবতীর রাঙা হইয়া উঠিল।

'তারপর বল ভাই, আর সব খবর কি !'

'খবরের মধ্যে আর কিছু নেই। আপাতত পুরী থেকে আমাদের ওখানে এসেচেন বড় মাসীমা, ছেলেরা আছেন সঙ্গে।'

সত্যবতী কহিল, 'বড় মাসীমা ভাল আছেন ?'

'মন্দ নেই, সময়টা তাঁর বোধ হয় একটু ভালই যাচ্চে, তা ছাড়া, অত বড় বিষয়-সম্পত্তির মালিক, ভাবনা-চিন্তা নেই। এসেই ত পুষ্পহার দিয়ে ললিতার মুখ দেখলেন, তোমার বৌদিদির মুখের দাম যে এত এর আগে জানতুম না, এবার থেকে তাঁর মুখোমুখি হওয়া হয়ত কঠিন হবে।'

বড়বউ হাসিতেছিলেন, সত্যবতী কহিল, 'বড়দি' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যান্, বৌদির কথায় দাদা কেমন পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন।'

'ওটা যে ললিতার লালিত্য ন-বৌ।' বড়দিদি কহিলেন।

'আচ্ছা তবে থাক্—' দাদা কহিলেন, 'এই চুপ করলুম। এর পর শুধু খবরই দিয়ে যাবো। প্রথম নম্বর হচ্চে, বড় মাসীমা যাচ্চেন তীর্থে।'

তীর্থে? কোথায়?

মথুরা, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য,—তারপরে আসবেন প্রয়াগের মেলায়। কিছুদিন প্রয়াগে থাকবেন মেজ মেয়ের ওখানে, এই হিসেবটাই রয়েচে।'

'বেশ বেশ—' বলিয়া বড়বউ জলখাবারের আয়োজন করিতে চলিয়া গেলেন।

সত্যবতীর দ্রুত কল্পনা তীর্থের পথের দিকে ছুটিয়া গিযাছিল। কহিল, 'কে কে যাবেন দাদা?'

দাদা কহিলেন, 'বড় মাসিমা আর তাঁর ছোট জা, আরো দু'চারজন বুড়ি, সঙ্গে চল্‌চেন পরেশ আর সরকার মশাই।'

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সত্যবতী কহিল, 'আমার গেলে হয় না দাদা?'

'তুমি কেমন করে যাবে? বিষ্ণুর চক্রে যে বাঁধা?'

'ঠাকুর ফেলে ত ঠাকুরের কাছে যাবো, বিষ্ণু ত আর আমায় বেঁধে রাখেননি, ছেড়ে দিয়েছেন।'

'পথের যে বড় কষ্ট বোন্।'

'কষ্টই যে ভাল লাগে দাদা; দাঁড়াও আসচি।' বলিয়া সত্যবতী বাহির হইয়া গেল। বড়বউ তখন কাঁচের ডিস আনিবার জন্য নিজের ঘরে ঢুকিয়াছিলেন, সত্যবতী ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল কেদারবাবু একখানি বই লইয়া খাটে শুইয়া ধীরে ধীরে গড়গড়ার নল টানিতেছেন। মাথায় ঘোমটা টানিয়া মৃদুকণ্ঠে সে কহিল, 'বড়দি, আমি যদি যাই মাসিমার সঙ্গে, কেমন হয়?'

কেদারবাবু বই রাখিয়া কহিলেন, 'কোথায় মা?'

বড়বউ কহিলেন, 'ওর বড় মাসিমা যাচ্ছেন তীর্থে, সেই কথা বল্‌চে!—বিষ্ণুকে প্রাণ ধরে আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারবি?' বলিয়া কাঁচের প্লেট্ লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কেদারবাবু কহিলেন, 'দাদা এসে খবর দিলেন বুঝি? সত্যিই কি তোমার যাবার ইচ্ছে হয়েছে মা?'

সত্যবতী কহিলেন, 'এখনো দিন আষ্টেক সময় রয়েছে, একজন ব্রাহ্মণ ডাকিয়ে শ্রীবিষ্ণুর ভার দিয়ে যেতে হবে।'

'বেশ, তাই হবে। সঙ্গে কে যাবেন?'

'আমার বড় মাসিমার ছেলে আর সরকার মশাই। কোনো ভাবনা নেই।'

কেদারবাবু কহিলেন, 'সেই কথা বলে যাবে মা, যে, পায়ে তোমার কাঁটাটি ফুটবে না। বেশ, আমি কালকেই ব্যবস্থা করে দেবো, টাকা বেশিই সঙ্গে নিও।'

সত্যবতী সাশ্রুনেত্রে এই দেবতুল্য ভাসুরের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সেইদিন হইতেই একটা তাড়াহুড়া পড়িয়া গেল।

খবর পাইয়া এ আসিল, ও আসিল, পাড়ার মেয়েরা যাতায়াত করিতে লাগিল। আপন ইচ্ছায় সত্যবতী এ সংসারে অনেক বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছে, সেগুলি একে একে ছাড়াইতে দেরি লাগে। শিবানীকে দিল হোমিওপ্যাথী ঔষধের বাক্স ও বই, পুষ্পলতার হাতে ছাড়িয়া দিল 'সিঙ্গারের' মেসিনটি, নতুন-বৌয়ের উপর ভার পড়িল পড়াশুনা করাইবার। বাড়ীর কাজকর্ম্ম একটু হাল্‌কাই হইয়া গিয়াছে। ঝি-চাকর ও রাঁধুনে বামুন নানা উপদেশ লইতে লাগিল। দুইজন গৃহশিক্ষক, তাঁহারাও সেদিন সত্যবতীর নিকট ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে নানা পরামর্শ লইয়া গেলেন। জায়েরা ভাবিয়া আকুল হইলেন, কেমন করিয়া সুশৃঙ্খলায় এই সংসার সত্যবতীর অনুপস্থিতিতে চলিবে, কারণ এ-সংসার সত্যবতীরই; এ তাহারই নির্ম্মাণ, তাহারই সৃষ্টি। যদি অচল হয় তবে অচলই থাকিয়া যাইবে, সচল করিবার তত্ত্ব ও কলা-কৌশল তাঁহাদের জানা নাই। ফুলের সঙ্গে যেমন বৃন্তের সম্পর্ক, এই সংসারের সহিত সত্যবতীর।

মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া তাঁহারা কহিলেন, 'ফিরতে কতদিন লাগবে ন-বৌ?'

'মাস দেড়েকের মধ্যেই ফিরব আশা করচি।'

'ও বাবা, সে যে অনেকদিন ভাই, আমরা যে অকুলে ভাসলাম! তার আগে ফিরতে পারবি নে?'

'ভাল না লাগলেই ফিরে আসবো সেজ-দি, আগেই চলে আসবো।'

সেজবউ কহিলেন, 'আশীর্বাদ করি তোর ভাল যেন না লাগে। আর থাকতেই কি পার'ব তোর ঠাকুর ছেড়ে? দেখিস আমরা তোর ঠাকুরকে উপোস করিয়ে রাখবো।'

বলিয়া তাঁহারা হাসিতে লাগিলেন।

দিল্লীর দেবর প্রশান্তর নিকট সত্যবতী পত্র দিয়াছিল, তাহার একটি সুন্দর জবাব আসিয়াছে। লিখিয়াছে, 'ইতিমধ্যে তোমার শ্রীচরণ দর্শনে একবার যেতাম, কারণ তোমার চরণ দু'খানির প্রতিই আমার লোভ, কিন্তু যাব না, শুনেছি তুমি মাথা ন্যাড়া করেচ,—এমন অসুন্দর আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তি তোমার মতো মেয়ের কাছে প্রশ্রয় পেলো কেমন করে? যাই 'হোক' ইষ্টারের ছুটির মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার মাথায় নব দুর্বাদল দেখা দেবে, সেই সময়ে যাবো। তীর্থের পথে এসে এই সতীর্থটিকে যদি একবার দেখে যাও তবে ধন্য হই। ভালবাসা ও প্রণাম নিও।'

ঠাকুরের ব্যবস্থাই সকলের চেয়ে সুন্দর হইল। সকাল-বিকাল দুইবার করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণ আসিবেন, আপন হাতে তিনি ভোগ রাঁধিয়া অতি শুদ্ধাচারে নিবেদন করিবেন। মালী দুইবার করিয়া আনিয়া দিবে ফুল, বিল্বপত্র ও মালা, ভারী আনিবে গঙ্গাজল ও মৃত্তিকা। বড়ঠাকুর দেখাশুনা করিবেন।

যথাদিনে এবং যথাসময়ে দাদা তাহাকে লইতে আসিলেন। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া সত্যবতী ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গেল। ঘরে ঢুকিয়া অশ্রুবিগলিত চক্ষে কহিল, 'স্বপ্নে আমাকে অনুমতি দিয়েচ হাসিমুখে, ফিরে এসে যেন এমনি হাসিমুখই তোমার দেখতে পাই ঠাকুর!' তারপর ভূমির পরে সাষ্টাঙ্গ লুটাইয়া বলিতে লাগিল, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি!'

ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া চক্ষু মুছিয়া তীর্থ-যাত্রিনীর বেশে সে যখন নীচে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল,—চারিদিকে দেখিয়া সে বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া পড়িল। এ-পাড়া ও-পাড়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মৃদু মধুর হাসিয়া সে সকলের দিকে তাকাইল; এই নির্বাক অভিনন্দনের প্রতি লজ্জায় তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল।

আদর ও সম্মান, দাক্ষিণ্য ও স্নেহ,—ইহারা যে-গৌরব তাহাকে দান করিয়াছে, হে ঠাকুর, সে যেন সর্বান্তঃকরণে তাহার উপযুক্ত হইতে পারে। সে যেন ইহাদের ভার বহন করিবার শক্তিলাভ করে। আজিকার যাত্রা যদি শেষ হইত, যদি এমনি স্নেহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া ইহারা তাহাকে চিতায় তুলিয়া দিয়া আসিত তবে তাহাই হইত তাহার পরম পাথেয়। আনন্দ ও বেদনায়, সুখে ও অতৃপ্তিতে হৃদয় উদ্বেল হইয়া তাহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

জিনিষপত্র আগেই মোটরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবার সে একে একে সকলের নিকট বিদায় লইয়া দাদার সহিত গাড়িতে গিয়া উঠিল।

সমস্ত বাড়ীটা নিস্তেজ ও নির্জীব হইয়া গেল; দেহ হইতে যেন আত্মা চলিয়া গিয়াছে।

* * *

শীতের হাওয়া পশ্চিমে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। পথে আর বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। প্রথমে গয়া হইয়া যাত্রীর দল বারাণসীতে পৌছিল। সেখানে দিন চারেক থাকিয়া তাঁহারা অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। সম্মুখে চলিতে সত্যবতী পিছন ফিরিয়া তাকায় না, এ তাহার প্রকৃতি নয়। তীর্থের পথ যে এত মধুর, দেশ-দেশান্তরের বাতাস যে এত আনন্দদায়ক, ইহার আগে সে জানিত না। পথে পথে বৈচিত্র্য ও বিস্ময়; কত গ্রাম, কত নদী ও প্রান্তর,—কত সুখ-দুঃখ ভরা, হাসি ও অশ্রু মিশানো এই সুন্দর পৃথিবী। সকালের কোমল আলো, মধ্যাহ্নের ধূলি-ধূসরিত রৌদ্র-পথ, দিনান্তের ম্লান আকাশ,—ইহারা যেন তাহাকে

ডাকিয়া ডাকিয়া নিরুদ্দেশের পথে লইয়া যাইতেছে। এই টেলিগ্রাফের তার, নীচের লৌহপথ, উচ্চকিত শ্যামা পাখীর দল, বনচ্ছায়ার ওই আলো আঁধার, শস্য-ক্ষেত্রের ওই আঁকা-বাঁকা আইল, গ্রামান্তর সঙ্কীর্ণ পথরেখা—ইহারা যেন তাহার চোখে একটি মায়া বুলাইয়া দিয়াছে।

অযোধ্যার এই ধর্মশালায় দিন তিনেক থাকিয়া শহর ঘুরিয়া রামচন্দ্রের মন্দির দর্শন করিয়া আবার একদিন সকলে গাড়ীতে উঠিল।

একাকিনী সে, সত্যই একাকিনী। এতগুলি তাহার সঙ্গী, আত্মীয়, এত পথের পরিচয়,—তবু রুদ্রাক্ষের মালা ধরিয়া জপ করিতে বসিয়া মনে হয় তাহার চারিধারে কেহ নাই। সংসারের ভিতরে থাকিয়া সে পরিপূর্ণ ছিল, তাহার গতি ছিল, ক্রিয়াশীল ছিল,—কিন্তু এ-পথ কানে কানে তাহার কী বলিতেছে। পাখী যখন উধাও হইয়া শূন্যে উড়িতে থাকে তখন সে নিজের মনে কী কথা বলে!

মথুরায় নামিয়া সবাই বিশ্রামঘাটে স্নান করিল। শহর এবং শহরের বাহিরে কত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, কত কীর্তি, কত কাহিনী। বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন অতীত যুগের বাতাস আসিয়া সত্যবতীর মুখে চোখে সুদূর বেদনার মতো স্পর্শ করিতে লাগিল। মথুরা হইতে টাঙায় করিয়া তাহারা চলিল বৃন্দাবনের পথে। দুই ধারে ফণীমনসা এবং বাবলার জঙ্গল; কোথাও কোথাও দরিদ্র গ্রাম। এই পথটী ধরিয়া একদিন পলাইয়াছিল সেই নিষ্ঠুর, সেই বংশীধারী বিজয়ী ব্রজের দুলাল,—নারীর হৃদয়কে শতবর্ষ পীড়ন করিয়া যে চিত্তচোর মানবসমাজে আজিও মহীয়ান্ হইয়া আছে। যে চির-বিরহিনীর অশ্রু একদা এই পথটিকে অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজিও সেই বৈরাগ্যবেশিনী নারী ধূলার অঞ্চল উড়াইয়া দেহহীন প্রেতিনীর মতো কাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

বৃন্দাবনের 'ধীর সমীরে' তাহারা আসিয়া আস্তানা পাতিল। দেখিল তাহারা অনেক। কিন্তু কোথায় সেই কল্প-কামনায় ঘেরা চিরদিবসের ব্রজপুরী!

সেই ত শীর্ণপ্রবাহিনী যমুনা আজিও বহিতেছে কিন্তু এ ত সেই কূলে-কূলে ভরা কালিন্দীর উপকূল নয়! কোথায় সেই তমালকদম্বের ছায়াবীথিকা, শত গোপিনীর কণ্ঠে কোথায় বাজিয়া উঠে আজ সেই শাওনের গান, কোন্ পথে বাজে সেই চিত্তপাগলকরা বাঁশের বাঁশরী, কোথায় দুগ্ধ দোহনের কোলাহলে রাখাল বালকের ঘুম ভাঙে, রাত্রির নিভৃত অন্ধকারে কোন অভিসারিকা কোথায় বাহির হয়, কোন পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মাতৃ-স্বরূপিনী দেবী যশোদা চঞ্চল বালকের আশায় তাকাইয়া থাকেন।

বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কয়েকদিন পরে যাত্রীর দল আসিল আগ্রায়। দুর্গ-প্রাকারের তীরে বসিয়া অতীত কাল কাঁদিতেছে। যমুনার তীরে সেই মর্মর-স্বপ্ন তাজমহল আজিও তপস্যায় বসিয়া আছে। জ্যোৎস্না রাত্রে বসিয়া সত্যবতী নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিল!

এমনি করিয়া প্রায় কুড়ি দিন পরে নৈমিষারণ্য হইয়া তাহারা প্রয়াগে আসিয়া পৌঁছিল। ত্রিবেণীর ঘাটে তখন মেলা বসিবার দিন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই মেলা চলিবে।

হিউয়েট রোডের ধারে বড় মাসীমার মেজ মেয়ে বিমলার শ্বশুরবাড়ী। অবস্থা তাঁদের ভাল। দিদি এবং জামাইবাবু আসিয়া বহু সমাদরে সত্যবতীকে ভিতরে লইয়া গেলেন। তাহাদের সকলের বাস করিবার জন্য একটা মহল খালি করিয়া দেওয়া হইল। এবারে কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত বিশ্রাম।

এদিকে কলিকাতার সংসার নানা অসুবিধার আবর্তে বাধা পাইয়া চলিতেছিল। সত্যবতী ফিরিয়া না আসিলে আর চলে না। শৈলর বিবাহের নির্দিষ্ট তারিখ নিকটতর হইয়া আসিতেছে। পাকা দেখা শেষ করিয়া কেদারবাবু সত্যবতীকে পত্র দিলেন। বাড়ী মেরামত হইবে কি না, কি-কি গহনা গড়াইতে দেওয়া হইবে, এই সকল কথা তিনি জানিতে চাহিয়াছেন। সত্যবতী ফিরিয়া না আসিলে ফর্দ করা অসম্ভব—এই সব আলোচনা। এবং পরিশেষে ইনস্যুওর্ড খামে করিয়া কিছু টাকা সত্যবতীর নামে পাঠাইয়াছেন। সত্যবতীর নিকট হইতে

উত্তর আসিল, যে-তারিখের আন্দাজ তিনি দিয়াছেন সেই তারিখেই সে আসিয়া পৌছিবে।

এবং সেই নির্দিষ্ট দিনটিতেই সে প্রায় দীর্ঘ দেড মাস প্রবাসের দিনগুলি শেষ করিয়া পুনরায় হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া সে দেখিল, বড়ঠাকুর, সেজদি, ইন্দুবালা, নরু, কানাই টুনু—অনেকেই তাহাকে লইতে আসিয়াছে। কী আনন্দ, কী উল্লাস! সত্যবতী কেদারবাবু ও ইন্দুবালার পায়ের ধুলা লইল। কেদারবাবু কহিলেন, 'সঙ্গে কে এসেচে মা?—বড় কাহিল হয়ে গেচ!'

সত্যবতী ঘোমটা টানিয়া কহিল, 'সেকেণ্ড ক্লাসে মেয়েরা ছিলেন, আমি একাই এসেচি তাঁদের সঙ্গে।'

'একা? তুমি ত দিগ্বিজয়িনী!'—কেদারবাবু কুলি ডাকিয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন।

সকলে তাহাকে ঘিরিয়া নিজে সকলের মাঝখানে থাকিয়া ইন্দুবালার হাতে হাতে জড়াইয়া সে ষ্টেশনের বাহিরে আসিল। দুইখানি মোটর প্রস্তুত। আজ সকলের বড় আনন্দ।

ইন্দুবালা কহিল, 'রোগা আর কালো হয়েচে, চোখ দুটো কী বড় হয়ে উঠেচে রে?'

সত্যবতী ম্লান হাসি হাসিল।

'কী ঝগড়া-ঝাঁটি বাড়ীতে—' ইন্দুবালা বলিতে লাগিল, 'মেজদি একটু আরামপ্রিয়, তাই নিয়ে বড়দির সঙ্গে বকাবকি·· একটু বিবাদ বাধলেই সেই পুরানো গায়ের জ্বালাগুলো ফুটে বেরোয়। আমি মাঝখানে বাপের বাড়ী পালিয়েছিলুম ··ছেলেমেয়েগুলো রোগা হয়ে গেচে—'

সত্যবতী কান পাতিয়াছিল কিন্তু কিছুই তাহার কানে যাইতেছিল না। মোটর হু হু করিয়া ছুটিতেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, সত্যবতী পৌছিবার দুই দিন না যাইতেই দেখা গেল আর

তাহাদের মধ্যে বিবাদ নাই, সবাই একই জায়গায় আসিয়া মিলিয়াছে। সংসারের নানা বিশৃঙ্খলা আবার মেরামত করিতে হইল, সকলেরই মুখে ফুটিল হাসি। এই বাড়ীতে যাহারা চাকরী করে,—দাস, দাসী, রাঁধুনে, মালী, ভারী,—তিরস্কার ও লাঞ্ছনা এই দেড় মাসে যাহাদের মাথা ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহারা এবার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতদিন পরে আবার তাহাদের মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে।

কিন্তু দিন আর বাকী নাই। নিঃশ্বাস ফেলিবার আর অবসর না দিয়া ভাসুররা তাহাকে লইয়া বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিয়া গেলেন। গহনা গড়াইয়া আসিল, আটচালা বাঁধিবার চেষ্টা হইতেছে, ফর্দগুলি প্রায় প্রস্তুত, লোকজন নানাদিকে মোতায়েন হইল। ইতিমধ্যে বাড়ী মেরামত হইয়া গেছে; ইলেক্‌ট্রিকের তার লাগাইয়া বহুসংখ্যক আলোর ডুম সারা বাড়ীতে লাগানো হইল, বাড়ীর দরজায় বসিল সানাই, ছাপানো নিমন্ত্রণ-পত্র ছুটিল,—সকল ব্যবস্থাই সত্যবতীর।

বিবাহের দিন সকালে আসিয়া পৌঁছিল প্রশান্ত। সত্যবতী ছিল ঠাকুর-ঘরে, সংবাদ পাইয়া নীচে নামিয়া আসিল। প্রশান্ত সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিল তাহার কাছে। উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া কহিল, 'বৌদি' মহারাণী!'

সত্যবতী এতদিন পরে হাসিল। শুভকাজ এইবার সর্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। কাছে আসিয়া দেবরের হাত ধরিয়া কহিল, 'পথে কষ্ট হয়নি ত?'

'ভয়ানক কষ্ট হয়েচে। তোমাকে ভুলে থাকি সে এক কথা, মনে পড়লেই পথ আর ফুরোতে চায় না। এই যে চুল গজিয়েচে দেখ্‌চি। পায়ের ধূলো দাও।'

পায়ের ধূলো লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সত্যবতী কহিল, 'তোমার বিয়েটা দিতে পারলেই আমরা এবার নিশ্চিন্ত হই।'

'তারপর কী, কাশীবাস, না বানপ্রস্থ?'

'বানপ্রস্থই যদি নিই, তুমিও যাবে সঙ্গে; ফলমূল এনে দেবে।'

'তা দেবো, কিন্তু শুধু পায়ের দিকে তাকিয়ে চোদ্দ বছর কাটাতে পারবো না, তা আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি। আমি কলিযুগের ঠাকুরপো।'

দুইজনেই হাসিতে লাগিল। সত্যবতী কহিল, 'পাশ করে এসেচ, এবার আমাদের খাইয়ে দেবে ত?'

প্রশান্ত কহিল, 'দেবো, বিয়েটা শৈলর চুকে যাক্, কলকাতায় একটা কাজ নিয়ে বসি। যত পারো খাওয়াবো।'

সত্যবতী কহিল, আজ তোমার কোন কাজ নেই, অবারিত বিশ্রাম, ট্রেন থেকে নেমেচ। কেবল সন্ধ্যাবেলা যারা পরিবেশন করবে তাদের একটু তদ্বির ক'রো।'

'যথা আজ্ঞা মহারাণী! শোনো, তাড়াতাড়িতে আমাদের কথা হবে না,—কাজটা শেষ হোক, তোমার ঘরে বিরাট আড্ডা বসাবো।' বলিয়া প্রশান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মহাসমারোহে ধুমধাম করিয়া বাজনা বাজাইয়া সোরগোল করিয়া বিবাহ চুকিল। বর-কনে বিদায় লইল, এবং সবাই প্রায় একজনকে প্রশংসা, আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া চলিয়া গেল—সে একজন সত্যবতী। যশ ও অর্থ যখন পথ কাটিয়া একবার আসিতে আরম্ভ করে তখন তাহার চেহারা অনেকটা নদীর প্রবাহের মত অনর্গল। জনসাধারণের ধারণা হইয়া গেল, এই শুভ কার্যের পিছনে থাকিয়া যে মানুষটি সকল আয়োজন সুন্দর করিয়া সমাপ্ত করিয়াছে, সে এ-বাড়ীর ন-বৌমা। নবীন বয়সের মেয়ের খ্যাতি সামান্য বাতাস পাইলেই বহুদূর পর্যন্ত সহজেই প্রসারিত হয়; তাহাকে সানন্দে প্রাধান্য দিবার জন্য জগতসমাজ উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। সত্যবতী মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার কথা জানিত, এবং জানিত বলিয়াই সে শত অনুরোধেওবিবাহ-সভাকে এড়াইয়া ঠাকুরঘরে লুকাইয়া বসিয়াছিল।

আপন শক্তিকে ক্ষয় করিয়া বলবান যেমন বসিয়া বসিয়া হাঁপায় তেমনি শুভ-বিবাহের পর কিছুকাল ধরিয়া এই বৃহৎ পরিবারটি কতক পরিমাণে নিস্তেজ হইয়া রহিল।

'শৈলকে ছাড়লাম কিন্তু তার বদলে পেলাম তোমাকে, বুঝলে ঠাকুরপো ?'

প্রশান্ত হাসিয়া কহিল, 'আমার ত ঠিক তা মনে হচ্চে না বৌদি, তুমি যেখানে রয়েচ আজকাল, সেখানে মায়া আর মোহ দুটো বস্তু পৌছুতে পাচ্ছে না।'

সত্যবতী কহিল, 'বিশ্বাস হলো না আমার কথা ?'

'না—' প্রশান্ত কহিল, বিশ্বাস করবার পথ হারিয়েচে ; তুমি এমন এক জায়গায় তপস্যায় বসেচ যেখানে মর্ত্যের মানুষ আমরা সহজে পৌছুতে পারিনে।'

হাসিমুখ করিয়া সত্যবতী কহিল, 'এবারে তুমি অভিমানের বোঝা এনেচ সঙ্গে। তুমি ত এমন ছিলে না ভাই।'

'নিজের বিচারটাই তোমার বড় হয়ে উঠ্‌ল বৌদি—' প্রশান্ত কহিল, কিন্তু আমার যে দেখা আছে, তোমার প্রাণচাঞ্চল্যের কী রূপ ; আমি ত জানি তোমার স্নেহের উত্তাপটুকু ছিল কত নিবিড়। আজ তুমি আর সে-বৌদি নেই। তুমি বড় হয়েচ, তাই একান্ত করে আর তোমাকে পাওয়া বড় কঠিন।'

সত্যবতী কহিল, 'আমারও যে অভিমানের ক্ষেত্র রয়েচে ঠাকুরপো। শুধু বড় হওয়াটাই তোমরা দেখলে, যশস্বী হওয়াটাই তোমাদের চোখে পড়ল। কিন্তু এ-কথা ত সত্যি, সংসারে এসে বিশিষ্ট আসন আমি চাইনি, আমি চেয়েছিলাম সকলের মাঝখানে বসতে। আজ আমার জীবন থেকে যশের রঙটা যদি মুছে যায় তবে কী থাকে বল ত ?"

সে আর দাঁড়াইল না, যেমন প্রশান্তর ঘরের দরজায় আসিয়া দেখা দিয়াছিল, তেমনি আবার দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিকালের মলিন আলোটুকু আসিয়া পড়িয়াছে জামগাছের পাতায় পাতায়, সূর্যাস্তের আর বিলম্ব নাই। নীচের বাগানে পুরাতন অশোকের গাছটি বসন্তকালের ফুলে ফুলে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। আকাশের কোলে কোলে বাউল মেঘের দল, তাহাদের ক্রমবিলীয়মান বর্ণ, নীড়ে ধাওয়া পাখীর ডানায়

শব্দ, দিন-দেবতার চোখে সায়াহ্নকালের তন্দ্রাজড়িমা—ইহাদের দেখিয়া দেখিয়া কত দিন সত্যবতীর কাটিয়াছে, কিন্তু দেখা আর ফুরায় নাই। কখন্ ঘনায় অন্ধকার, আকাশের নক্ষত্রগুলি উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, রজনীগন্ধার ভীরু গন্ধে তাহার ঘর ভরিয়া যায়, নিশীথিনী যোগাসনে বসিয়া আপন হৃদয়ের রহস্যের সন্ধান করে—তবু তাহার নিমীলিত দৃষ্টির দেখা আর ফুরাইতে চায় না।

চমক ভাঙে যখন ঠাকুরের কথা মনে পড়ে। ওই যা, এখনো যে আরতি হয় নাই! ছুটিয়া সে তেতলায় উঠিয়া ঠাকুর-ঘরে যায়। আলো জ্বালিয়া আসনে বসিয়া সে একটি প্রণাম করে। এই অকারণ বিলম্বের জন্য মনে মনে মার্জনা চাহিতে গিয়া সে ঠাকুরের মুখের পানে তাকায়। ওই ত প্রসন্ন দৃষ্টি, অচপল হাসি মাখানো দুটি আয়ত চক্ষু, ভ্রূকুটিহীন বৈরাগ্য ও প্রীতিতে উজ্জ্বল মুখশ্রী,—ক্ষমা চাহিবার ত তাহার প্রয়োজন নাই। এক হাতে মঙ্গলঘণ্টা, অন্য হাতে পঞ্চপ্রদীপ লইয়া সে আরতি করে। ফুল দেয়, চন্দন দেয়, হৃদয়ের সুরখানি দিয়া স্তবপাঠ করে। আরতি হইয়া গেলে রুদ্রাক্ষের মালা লইয়া চক্ষু বুজিয়া সে জপ করিতে থাকে।

আবার সেই রোমাঞ্চকর অর্ধজাগ্রত স্বপ্ন! মাথার পরে গগনচুম্বী স্বর্ণকিরীট, চক্ষে নিবিড় জীবন-পিপাসা, অধরে পূর্ব-গগনের প্রভাতজ্যোতির মতো সুন্দর হাসির রেখা, বায়ু-আন্দোলিত গন্ধের ইঙ্গিতময় উত্তরীয়, নবীন নীরদশ্যামা দেবমূর্তি,—কে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল? তুমি ত নও ইষ্টদেবতা, কে তুমি? তুমি এসেচ মৃত্যুর মধুরতা নিয়ে, বজ্রের জ্বালা নিয়ে; তোমার এক চোখে উদ্বেল সমুদ্র, অন্য চোখে অরণ্যের গভীর ব্যাকুলতা—তুমি কী চাও আমার কাছে?—জপের মালায় সত্যবতীর আঙুলগুলি আড়ষ্ট হইয়া আসিল।

নারীর অন্তপুরে রাত্রির অন্ধকারে চোরের মতো চুপি-চুপি তোমার আনাগোনা; তোমার গতিবিধি অশোক আর দাড়িম্ববনের রক্তরাঙা পথে শ্রাবণ-বর্ষণের দুর্যোগ-নিশায়, ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-তরঙ্গের চূড়ায়-চূড়ায়, প্রলয়ঙ্কর কালবৈশাখীর রথচক্রের পরে। তোমাকে দেখেছি প্রজাপতির সোনার

পাখায়, কনক চম্পকের স্বর্ণরেণুতে, অলস মৌমাছির অশ্রান্ত গুঞ্জনে, রজনীগন্ধার হৃদয়ের গোপন গন্ধে।—সত্যবতী চোখ খুলিয়া চাহিল। সে আলো তেমনি করিয়া জ্বলিতেছে, সেই প্রসন্ন হাসিমাখা ঠাকুরের সুন্দর মুখ, সেই ধূপধুনা ও পূজার উপকরণ তাহার সম্মুখে, সেই দেয়ালে পড়িয়াছে তাহার দেহচ্ছায়া,—তবে ?

আঙুলগুলি একত্র করিয়া সে পুনরায় জপের মালার এক একটি রুদ্রাক্ষের দানা সরাইয়া চলিল। হাত দুইখানি তাহার কাঁপিতেছে, চোখের পাতা কাঁপিতেছে, নাসিকা স্ফুরিত হইতেছে।

'বৌদি ?'

সত্যবতী মুখ ফিরাইয়া তাকাইল, এবং তাকাইয়া অনুভব করিল তাহার চোখে অশ্রু জমিয়া উঠিয়াছে। মালাটি কপালে ঠেকাইয়া বাঁ-হাতে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, 'ঠাকুরপো' এসো ভাই।'

প্রশান্ত কহিল 'ভয় করে বৌদি তোমার দিকে এগিয়ে আসতে। জপ করতে অনেককে দেখেছি কিন্তু আস্ত একটা মানুষ কেমন করে পাথর হয়ে যায় তা তোমাকে দেখে বুঝতে পারি।' বলিয়া সে একটু থামিল, পুনরায় কহিল, অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। কিন্তু কা'কে দেখব বল ত, বিষ্ণুকে না তোমাকে ? ঠাকুরের ছবিতে দেখেছি তাঁর মুখের চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডল, ভাবতাম উক্ত চিত্রকরদের এ বুঝি-বা একটা কল্পনা, আজ তোমাকে দর্শন করে বুঝতে পারছি কখন্ মানুষের চেহারা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।'

ঠাকুর প্রণাম সারিয়া সত্যবতী উঠিয়া আসিল। বলিল, 'বাঃ এ যে তুমি খুশী হবার মতো কথা বললে ঠাকুরপো !'

প্রশান্ত কহিল, 'খুশী হও কিন্তু খোসামোদ মনে করে আমাকে ছোট করতে চেয়ো না বৌদি। আমাকে বুঝতে যদি না পারো ক্ষতি নেই, কিন্তু ভুল বুঝে পীড়ন করো না।'

খোলা ছাদের মাঝখানে আসিয়া দুইজনে বসিল। সত্যবতীর কপালে

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিয়াছিল, এইবার ছাদের খোলা হাওয়ায় তাহার সর্বশরীর জুড়াইয়া গেল। সে হাসিয়া কহিল, 'জপে যখন বসি কেউ কাছে আসে না, জপ শেষ হবার আগেই তুমি কোন্ সাহসে আমাকে ডাকলে ঠাকুরপো ?'

প্রশান্ত কহিল, 'আমার যে একটা সময় বাঁধা থাকে,—জানি এতক্ষণ থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত তোমার আসনের পাশে বাঘে-হরিণে জল খাবে, কিন্তু তারপর তোমার ধ্যান না ভাঙলে আমার হয় সন্দেহ ; যেমন আজ—'

'আজ ?' সত্যবতী তাহার মুখের পানে তাকাইল।

'আজ এবং এর আগে আরো কিছুদিন থেকে।' প্রশান্ত কহিল, 'তোমার জপের বাঁধাধরা টাইম্‌টায় একটা অনৈক্য দেখা দিয়েচে—'

'এ যে ভয়ানক অভিযোগ ঠাকুরপো, একেবারে যে পরকাল নিয়ে নাড়াচাড়া,—একটু ভেবে চিন্তে বল।'

প্রশান্ত হাসিল, হাসিয়া কহিল, 'ছেলেরা যখন বই নিয়ে পড়াশুনো করে তখন বোঝা যায়, কিন্তু যখন অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্রিকেট্ খেলার কথা ভাবে তখন—'

উপমাটা শুনিয়া সত্যবতী না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

অল্প অল্প আলাপ করিতে করিতে বহুক্ষণ ধরিয়া তাহারা খোলা ছাদের হাওয়ায় বসিয়া রহিল। আশপাশে প্রতিবেশীর ঘরে একটি একটি করিয়া আলো নিবিয়া আসিতেছে। নীচের তলায় জটলা একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিল। বসন্ত-বাতাস থাকিয়া থাকিয়া স্নেহ স্পর্শ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আকাশের নক্ষত্রগুলি তেমনি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেটা বোধ করি কৃষ্ণপক্ষ।

'আচ্ছা, বৌদি ?'

সত্যবতী মুখ নামাইয়া প্রশান্তর দিকে তাকাইল।

'তুমি জাতের বিচার মানো ?'

'মানি বৈ কি, কেন বল ত ?—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এর পাশে আর একটা কথা রয়েছে।'

প্রশান্ত কহিল, 'আমি কিন্তু মানিনে। এই জাতের বিচারটা মানুষকে স্বাভাবিক উন্নতি থেকে বঞ্চিত করেচে। আমি জাতের বিচারকে পরোয়া করিনে।'

সত্যবতী হাসিয়া কহিল, 'বেশ ত' নিজের বিচারকেই তুমি কাজে লাগাও, শূদ্র কিম্বা নমঃশূদ্রের ঘরে মালা-বদল করে ফেলো।'

প্রশান্ত কহিল, 'তাই যদি করি তোমরা আমাকে ক্ষমা করবে ?'

'আর সবাই করবে কিন্তু আমি হয়ত ক্ষমা করতে পারবো না।'

'কেন বৌদি ?'

সত্যবতী কহিল, 'ক্ষমা করবো না, যদি দেখি এর মধ্যে কেবল তোমার বাহাদুরি প্রকাশের চেষ্টাটাই কাজ করেচে, আন্তরিকতা একবিন্দু নেই। ঠাকুরপো, তুমি নিশ্চয় দেখতে পেয়েচ আজ এই অস্পৃশ্যতা দূর করার মূলে রয়েচে দাতা ও ভিক্ষুকের সম্পর্ক ; না আছে ভালবাসা, না-আছে আপন মানুষ বলে আপনার করে নেওয়া। অস্পৃশ্যরা আজ অশিক্ষিত ও দুর্বল, নৈলে তোমাদের এ অপমানের প্রতিশোধ তারা নিতে পারতো।'

প্রশান্ত উল্লসিত হইয়া সত্যবতীর হাত ধরিয়া কহিল, 'তবে ত সকলের আগে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে বৌদি। এবারে আর ভয় নেই। যে গল্পটা আমার জীবনে আরম্ভ হয়েচে, এখনো শেষ হয়নি, সেটা তোমাকে শুনতে হবে ; আমার সবচেয়ে গভীর কথা, সবচেয়ে গোপন।'

'একদিন অবশ্যই শুনিয়ে দিও, অপেক্ষায় রইলাম।' বলিয়া সত্যবতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি তাহার পায়ের ধূলা লইয়া বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, 'তুমিই আমার গল্পের বিচার করে দিও বৌদি, তোমার বিচারই আমি মেনে নেবো।'

৪

রবিবার। সকলেই বাড়ী আছেন। ইন্দুবালা ও প্রশান্ত একটু আগে গল্প করিয়া যে-যাহার ঘরে চলিয়া গিয়াছে। সত্যবতী একটা সেলাই লইয়া বসিয়াছিল। ও-বাড়ীর শিবানী ঘরের একান্তে মেঝেয় শুইয়া মহাভারতের একটা নূতন সংস্করণের উপর চোখ বুলাইতেছিল। নীচে রান্নাবাড়ীর দিকে বামুন ও চাকরেরা মিলিয়া চুপি চুপি তাস খেলিতেছে, মাঝে মাঝে তাস ভাঁজিবার শব্দ আসিতেছিল। দুপুরের নীরবতার উপর দিয়া এক একবার ছাদের কার্নিশ হইতে পারাবতের রুদ্ধকণ্ঠের আওয়াজ আসিয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে শেষ চৈত্রের গরম হাওয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া শিবানীর চোখে তন্দ্রা আনিয়া দিল, মহাভারতখানি তাহার বুকের উপরেই কাৎ হইয়া পড়িল। সত্যবতী হাসিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার নিদ্রিত চোখের উপর হইতে আলো বাঁচাইবার জন্য সুমুখের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। শিবানী এবাড়ীতে আসিলে হাত-পা ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হয়।

এমন সময় বাহিরে চটি জুতার শব্দ শোনা গেল। মেজঠাকুর হঠাৎ এ-মহলে কেন আসিলেন বুঝিতে না পারিয়া সে মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল। দরজার কাছে আসিয়া গলা বাড়াইয়া তিনি কহিলেন, 'ন-বৌমা, আছ নাকি ঘরে? ওদিকে একবার বড়দার ঘরে এসো, কথা আছে। শিগগির এসো, এক মিনিটও দেরি করো না।'—বলিয়া তিনি যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি মস মস করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহার গলার আওয়াজে শিবানীর তন্দ্রা ভাঙিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সত্যবতী আর এক মিনিটটও দেরি করিল না, প্রায় মেজঠাকুরকে অনুসরণ

করিয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'তুমি ঘুমোও শিবানী, আমি আসচি।'

বড়ঠাকুরের ঘরটি বাড়ীর আর সকল ঘরের চেয়ে বড়। সত্যবতী মাথার ঘোমটা টানিয়া চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াতেই ভিতর হইতে মেজঠাকুর কহিলেন, 'ভেতরে এসো ন-বৌমা।'

ডাকিবার ভঙ্গিটি তাঁহার ভাল নয়। তবু—সত্যবতী ভিতরে ঢুকিয়া বড়ঠাকুরের খাটের বাজুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে কেহ মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিল না, তাই সে ঘোমটার ভিতর হইতে সমস্ত ঘরটায় একবার নিঃশব্দে চোখ বুলাইয়া লইবার সুবিধা পাইল। বড়ঠাকুর চোখ বুজিয়া ওপাশ ফিরিয়া শুইয়া আছেন, সম্ভবত ঘুমাইয়া নাই; বড়দিদি মেজঠাকুরের পাশে জানালায় বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন; মিণ্টুকে কাছে লইয়া মেজদিদি টেব্‌লের পাশে মেঝের পরে নত মস্তকে বসিয়া; এদিকে সেজদিদি ইন্দুবালা, ওখানে একাকী বসিয়া আছে প্রশান্ত,—সে যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

এতগুলি লোক আজ এই ঘরখানিতে উপস্থিত, কিন্তু কাহারো মুখে কোনো কথা নাই। কেবল মাথার পরে বেগবান বৈদ্যুতিক পাথার কিচ্‌ কিচ্‌ শব্দ ঘরের ভিতরকার এই অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক নীরবতাকে অধিকতর গভীর করিয়া তুলিতেছিল। এমন একটা অবস্থা, যাহার গুরুত্বের সহিত সত্যবতীর কোনো পরিচয় নাই, সে ভীত ও চিন্তিত হইল। এই পরিবারের প্রত্যেকটি নরনারীকে সে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসে, সেও ফিরিয়া পাইয়াছে অপরিমিত স্নেহের আন্তরিকতা,—ইহাদের কোনো বিপদ ঘটে নাই ত? কিন্তু কাহাকেও ইঙ্গিত করিয়া কোনো প্রশ্ন করবার উপায় নাই, কেহ মুখ ফিরাইয়া কেহ মাথা হেঁট করিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

বড়বউ সকলের বড়, তিনি সর্বপ্রথম নিশ্বাস ফেলিয়া কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন, 'বেশ ত ছিলি, এমন ভূতে তোকে কেন ধরল ন-বৌ?'

মেজঠাকুর ছিলেন সভার মাঝখানে বসিয়া ; বড়বউয়ের কথায় স্নেহের আভাস পাইয়া হঠাৎ মাথা তুলিয়া তিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন ; তুমি চুপ করে থাকো, তুমিই আদর দিয়ে লোকের মাথা খেয়ে বেড়াও, বড়বৌ।'

'জানিনেকো বাছা তোমাদের কাণ্ড, এ পোড়ানি আমার সয় না। ছেলেমানুষ·· যতহ হোক, বুদ্ধি শুদ্ধি এখনও পাকেনি···'

মেজঠাকুর কহিলেন, 'চুপ কর তুমি বড়বৌ, পারিবারিক সম্মান আজ আমাদের বিপন্ন।'

"অতএব বড়বউ চুপ করিয়া গেলেন।

গলা ঝাড়িয়া মেজঠাকুর কহিলেন, 'তোমাকে একটা কথা বলবার জন্য ডেকেছি ন-বৌমা।' বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিতেই সত্যবতী দেখিতে পাইল, খামে মোড়া একখানা চিঠি।

'এই চিঠিখানা এসেছে তোমার নামে। কোন্ সময় পিওন দিয়ে গেচে কেউ ত্যাখেনি, মিণ্টু এখানা নিয়ে খেলা করতে করতে···নরু, তুমি উঠে নিচে চলে যাও—'

নরু বিছানা হইতে নামিয়া বাহির হইয়া নীচে চলিয়া গেল।

'হ্যাঁ—' মেজঠাকুর বলিতে লাগিলেন, 'মিণ্টু ছিঁড়ে ফেলেছিল। আমি যাচ্ছিলাম সদরের দিকে, ছেঁড়া চিঠি তার হাতে দেখে···বুঝলে প্রশান্ত, হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়েই চম্‌কে উঠলাম। বলি, এ কা'র চিঠি ন-বৌমা ?

সত্যবতী চুপ করিয়া রহিল।

'কার চিঠি তা আমরা জানিনে, নাম ঠিকানা নেই, তুমিই জানো এ চিঠি কার। এদিকে এসো, চিঠিখানা নিয়ে সকলের সুমুখে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে পড়' সবাই শুনুক এ চিঠিতে কী লেখা আছে। এই পরিবারের সবাইকে আজ যখন তুমি এতদূর অপমান করতে বসেচ, তখন ভাসুরদের সাম্‌নে এ চিঠি পড়তে তোমার বাধবে না। বল তুমি, এ কে ?'

সত্যবতী এবার মৃদুকণ্ঠে কহিল, নাম-ঠিকানা বল্‌তে নিষেধ আছে।'

'তা ত থাকবেই—' মেজঠাকুর হাঁকিয়া কহিলেন, 'নৈলে সুবিধে হবে কেন? এতে দেখচি আগের চিঠির কথাও রয়েচে। ক'খানা চিঠি এর আগে যাতায়াত করেছে?'

'আট-ন' খানা।'

'আছে সেগুলো তোমার কাছে?'

'না।'

যোগীন কহিলেন, 'এর সঙ্গে কবে তেমোর আলাপ হয়েছে?'

সত্যবতী নির্ভয় কণ্ঠে কহিল, 'এলাহাবাদে থাকতে।'

'দেখলে ত বড়বৌ, দেখলে? তোমরাই সবাই মিলে একলা বিদেশে পাঠিয়েছিলে, আমার ছিল বরাবর সন্দেহ—আজ দেখলে?'—সত্যবতীর দিকে ফিরিয়া যোগীন পুনরায় কহিলেন, 'এ চিঠি যে লিখেচে, মনে হচ্চে আমাদের সকলের চেয়ে এ তোমার আপন। এ-কলঙ্ক শুধু ত তোমার একারই নয়, আমাদের মুখেও যে কালি মাখিয়ে দিলে ন-বৌমা? ধরো, সবার সামনে এ চিঠি চেঁচিয়ে পড়ো'।

তিনি পুনরায় বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, 'অন্তঃপুরের বিধবা বউয়ের নামে যে ভাষায় আজ বাইরের লোক চিঠি লেখালেখি করচে, এ-রীতি তোমার বাপের বাড়ীতে চল্‌তে পারে, এ-বাড়ীতে চলে না। এ রকম চিঠি স্বামী লেখে স্ত্রীকে। তুমি আজ আমাদের বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেচ ন-বৌমা। দেখেচ, এ চিঠিতে তোমাকে কী বলে সম্ভাষণ করা রয়েচে? আশ্চর্য, আজ মনে হচ্চে তোমার সব মিথ্যে।'

বড়বউয়ের চোখে জল আসিয়াছিল, তাঁহার দিকে একবার তাকাইয়া ইন্দুবালা উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

'এঁরা সবাই তোমাকে বিশ্বাস করে এসেচেন, আমি করিনি, তোমার সম্বন্ধে বরাবর আমার কোথায় একটা সন্দেহ থেকে যেত। ছি, ন-বৌমা

যে দেবতুল্য স্বামী তোমার স্বর্গে গেচে তার প্রতি তোমার একটা কর্তব্য নেই, বিশ্বস্ততা নেই ? এখানে দাদা রয়েচেন, মেয়েরা রয়েচে, বেশি কথা বলা আমার ভাল দেখায় না,—তুমিও আমার মেয়ের মতন, কিন্তু এই কথাই কি আজ আমাদের বুঝতে হবে, সংসারে বিশ্বাসের দাম এক কপর্দকও নয় ? যে বস্তু নরনারীর মনে ইষ্টমন্ত্রের মত গোপন, অমৃতের চেয়ে যা পবিত্র, আকাশের ধ্রুবতারার মত যা স্থির এবং অচঞ্চল, সেই ভালবাসা আজ তোমার হাতে পড়ে বাজারের ধুলোয় লুটোলো ? ধরো এ চিঠি, পড়ে সবাইকে শুনিয়ে দাও তোমার মহৎ কীর্তির কথা।'

সত্যবতী নড়িল না, পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

যোগীন পুনরায় কহিলেন, 'এ বাড়ীর ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের ভার তুমি নিয়েচ, সংসার তোমাকে বসিয়েচে শ্রদ্ধা ও সম্মানের বড় আসনে, তোমার হাতে হয় কুলদেবতা নারায়ণের ভোগ, এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে দেশ-বিদেশে রটেচে তোমার খ্যাতি—অথচ কেউ এতদিন জানতে পারেনি গোপনে গোপনে তুমি কী হীন চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত, কী অশুচি মনোবিকার নিয়ে তোমার দিন কাটে। ন-বৌমা, একে তুমি মনুষ্যত্ব বল, এই কি তোমার মত হিন্দুনারী ও সাধ্বী কুলবধূর উচ্চ আদর্শ ? এত বই পড়েচ, এত তোমার জ্ঞান ও বিবেচনা, এটুকু শেখোনি, মানুষের চরিত্র পরীক্ষা কি দেখে হয় ?'

কিয়ৎক্ষণ তিনি থামিলেন। বজ্রাহত ও স্তব্ধ ঘরের ভিতর তাঁহার বিক্ষুব্ধ কণ্ঠের জ্বালা দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত হইয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি পুনরায় কহিলেন, 'সব তোমার মিথ্যে। তোমার ধর্মকর্ম মিথ্যে, তোমার ত্যাগ, সংযম, উদারতা মিথ্যে—'

প্রশান্ত উঠিয়া নতমস্তকে বাহির হইয়া গেল।

'তোমার শিক্ষা-সাধনা, তোমার দেব-দ্বিজে ভক্তি, ইষ্টমন্ত্র, জপতপ, তোমার তীর্থযাত্রা—তোমার সমস্ত কিছু মিথ্যার মায়া দিয়ে ঘেরা, প্রতারণায় পঙ্কিল,

গোপন বিশ্বাসঘাতকতায় ভয়ঙ্কর। যাও, চলে যাও, যে-মুখ তোমার সূর্যের দিকে ফেরানো ছিল, সেই মুখ জঞ্জালের বাল্‌তির দিকে ফিরিয়ে থাকো গে।' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যোগীন কুচি কুচি করিয়া চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

সত্যবতী টলিতে টলিতে বাহির হইয়া নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। শিবানী ইতিমধ্যে কখন চলিয়া গিয়াছে, সম্ভবত মেজঠাকুরের গলার আওয়াজ শুনিতে আর কাহারো বাকি নাই। ঘরের ভিতরে তাকাইয়া কোনো কাজ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সত্যবতী খানিকক্ষণ ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইল তারপর কাগজ-কলম বাহির করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল।—

শ্রীচরণেষু,

তোমার চিঠি যথাসময় এসেছিল, কিন্তু পড়বার সুযোগ ঘটেনি, অকস্মাৎ মেজভাসুরের হাতে পড়ায় আমাদের সম্পর্ক প্রকাশ হয়ে পড়েচে। সামাজিক মানুষের মন এ জাতের চিঠি সচরাচর কোন্ দৃষ্টিতে দেখে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এঁদের দোষ দিইনে। প্রাচীন সংস্কারের ধারায় এঁদের বিচারে নীতি ধর্মটাই বড় মানব-ধর্ম বড় নয়। আমি লাঞ্ছিত হ'য়েচি—কিন্তু লজ্জিত হইনি কারণ আমারো কর্তব্য র'য়েচে।

ভবিষ্যতে আমার পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত পত্রাদি দিওনা। প্রণাম গ্রহণ করো। ইতি ১৪ই এপ্রিল।

সত্যবতী

চিঠি শেষ করিয়া ঠিকানা ও নাম লিখিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। সম্মুখে পাইল কানাইকে। বলিল, 'নিয়ে যা ত বাবা কানাই, এই চিঠিখানা, এই নে পয়সা,—টিকিট লাগিয়ে একেবারে ডাকঘরে ফেলে দিয়ে আসবি। তাড়াতাড়ি যা, এখনো একটু সময় আছে।'

পয়সা ও চিঠি লইয়া কানাই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

যেন মৃত্যুর আঘাতে সমস্ত বাড়ীটা নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। নিষ্পন্দ ও আচ্ছন্ন। এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল যে, কেহ কাহারো নিকট আর মুখ দেখাইতে পারিতেছে না। একটা দুর্বোধ্য প্রশ্ন লইয়া যে-যাহার ঘরে নির্বাক হইয়া রহিল। যে ভিত সকলের চেয়ে পাকা বলিয়া বদ্ধমূল ধারণা, তাহারই তলায় ধরিযাছে ফাটল্, সমস্ত সংসারটি কাঁপিয়া উঠিয়াছে; ইহার পর সম্ভবত কেহ আর কাহারো উপব নিশ্চিন্ত নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিবে না।

সন্ধ্যার দিকে বড়বউ আর থাকিতে পারিলেন না। সত্যবতী যদি খানিকটা কান্নাকাটি করিয়া ক্ষমা চাহিয়া নিজের মনের কথা শুনাইয়া চলিয়া যাইত তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে থাকিতে পারিতেন; কিন্তু এই যে সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিঃশব্দ ও নির্বিকার হইয়া চলিয়া গেল ইহাতে তিনি ভয় পাইয়া গেলেন। অন্যায় সে করিয়াছে বটে, ছেলেমানুষ,— হিতাহিত বুঝিতে পারে না, লাঞ্ছনাও তাহার হইয়াছে যথেষ্ট, দুদিন পরে সে যখন আপনা হইতেই এ সমস্ত ভুলিয়া যাইবে তখন এ বাড়ীরও কেহ মনে রাখিবে না—কিন্তু আর কেন?

কোনো কোনো ঘরে উঁকি দিয়া তিনি দেখিযা গেলেন, সত্যবতী কোথাও নাই। এই সময়টা সে সাধারণত রাত্রের বান্নার হিসাব দিবার জন্য নীচে রান্নাঘরে বামুনের কাছে যায়, কিম্বা যায় কলঘরে স্নান করিতে, আব তা নৈলে চাকরদের ডাকিয়া সারাদিনের খরচপত্রের হিসাব লইতে বসে। কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বড়বউয়ের মায়ের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একালের মেয়েদের মন সাধারণত বড় ক্ষণভঙ্গুর, স্পর্শাতুর হৃদয় তাহাদের অল্প আঘাতে অভিমানে ভরিয়া ওঠে, ইহারা কোথায় ভাঙে এবং কোথায় গড়ে তাহা বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর,—এ মেয়ে যদি ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ কিছু খাইয়া বসে? প্রশান্তর ঘরে ঢুকিয়া বড়বউ দেখিলেন, একা প্রশান্ত চোখ

বুজিয়া শুইয়া আছে। সেখান হইতে বাহির হইয়া তিনি ছাদে উঠিয়া আসিলেন। ঠাকুরঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া ন-বৌকে দেখিতে না পাইয়া এবার কিন্তু সত্যই তাঁহার গলায় কান্না উঠিয়া আসিল। তিনি চঞ্চল হইয়া ছাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

'ওমা এই যে, বসে বসে মালাজপ হচ্ছে, আমি বলি কোথায় গেল। ঠাকুর-ঘরের পেছনে কেন রে ন-বৌ?'

কপালে মালাটি ঠেকাইয়া সত্যবতী কহিল, 'হাওয়া আছে এদিকটায়, তাই জন্যে—'

'তা হোক, নীচে আয়। পাঁচিলটা এদিকে ভাঙা, অত আল্‌সের ধারে তোর বসে থাকা হবে না। নীচের পাখায় কি হাওয়া নেই?'

সত্যবতী উঠিয়া আসিলে নিজের হাতে তাহার ঘোমটা খুলিয়া দিয়া বড়বউ কহিলেন, 'আ মরি, কি হাওয়ার ছিরি! ঘেমে যে নেয়ে উঠেচিস হতভাগি, জব্‌ জব্‌ কচ্চে সব,...সেমিজের উপর আবার জামা এই গরমে, আ মরণ,—নে খোল্‌, বোতামগুলো খুলে দে, হাওয়া লাগুক।' বলিয়া নিজের আঁচল দিয়া তিনি সত্যবতীর মুখ গলা ঘাড় বেশ করিয়া মুছাইয়া দিলেন।

প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, আত্ম-সমর্পণ করিতে হইল। তিনি তাহাকে টানিয়া নীচে লইয়া গিয়া একেবারে কলঘরে পাঠাইয়া দিলেন। সে যেন নিতান্তই ছেলেমানুষ। অন্য সময় হইলে কথা ছিল না, কিন্তু এ সময়ে বড়দিদির এই গোপন সহানুভূতি ও মমত্ববোধটুকু তাহার মনে আঘাত হইয়া বাজিতে লাগিল।

কলঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দালানে আসিয়া উঠিতেই বামুন-ঠাকুর কহিল, আলু-পটলের তরকারিতে কি মাছ দোব না মা?

মেজগিন্নি কানাইয়ের হাত হইতে খাবারের ঠোঙা লইয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'সে ব্যবস্থা আমিই করব ঠাকুর, দাঁড়াও আসচি।' বলিয়া কাহারো দিকে না তাকাইয়া চলিয়া গেলেন।

সত্যবতী তাঁহার পথের দিকে একবার তাকাইল, তারপর তাকাইল ঠাকুরের মুখের দিকে; নিজেকে সামলাইয়া পর মুহূর্তেই সে কহিল, 'বেশ ত ঠাকুর, মেজ-মা এলেই সব বুঝে নিও।'

এ একেবারে নূতন; তবে ন-মার ব্যবস্থার আগে ব্যবস্থা দিবার মানুষও এ-বাড়ীতে আছে? ঠাকুর স্তম্ভিত হইয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

সত্যবতী একটুখানি উদাসীন হাসি হাসিয়া কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল।

ঠাকুরের আরতির সময় হইয়াছে। তসরের থান্‌খানি পরিয়া ফুল-বিল্বপত্রের ডালা হাতে লইয়া সত্যবতী আসিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিল। আজ ঘর পরিষ্কারও হয় নাই, চন্দনও ঘষা হয় নাই,—কত কাজ তাহার বাকি। কাপড়ের প্রান্ত কোমরে জড়াইয়া সে তাহার নিত্যকর্মে বসিয়া গেল। ঠাকুরের প্রসন্ন মুখখানির দিকে সে একবার তাকাইল। তখন হইতে এ-বাড়ীর সকলের চেহারাই কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ঐ মুখখানিতে ত সেই আগেকার মতনই হাসি মাখানো, সেই স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়া, নিঃশব্দে বসিয়া বসিয়া ওই হাসিমুখখানি ত মানুষের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া যায়। হে অন্তর্যামী দেবতা তুমি জানো, অপরাধ করেছি কি না।—সত্যবতী একটি প্রণাম করিল।

বাহিরে পায়ের শব্দ পাইয়া সে একটু ত্রস্ত হইয়া ঠিক হইয়া বসিল। এমনি সময়ে আসে প্রশান্ত। আসুক,—কিন্তু সে কিছুতেই আগে কথা বলিবে না। প্রশান্তর মনের কথা আগে জানিয়া তবে সে নিজের কথা বলিবে। পায়ের শব্দ নিকটতর হইতেই বুঝা গেল, একজন নয়।

"ন-বৌমা, আছ নাকি ভেতরে?"

মেজঠাকুরের গলার আওয়াজ পাইয়া চন্দনমাখা হাতে সত্যবতী উঠিয়া আসিল।

'এই ইনি এসেচেন, সৎ ব্রাহ্মণ বলে এঁর যথেষ্ট সুনাম,—ভাটপাড়ায় বাড়ী,—আমাদের সৌভাগ্য যে ইনি আজ থেকে পুজো করবেন। আসুন

পণ্ডিতমশাই, দেখচেন ত আমাদের ঠাকুর-ঘর কোনো অসুবিধে নেই; সকাল-সন্ধ্যায় দু'বার আসবেন। এদিকে এসো ত ন-বৌমা, এ বেলার আরতিটা উনি সেরে যাবেন। ন-বৌমার আকিঞ্চনেই আমাদের ঠাকুর প্রতিষ্ঠা, বুঝলেন পণ্ডিত মশাই ?'

সত্যবতী বাহির হইয়া আসিতেই পণ্ডিত মহাশয় হেঁ হেঁ করিয়া হাসিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভিতরে মেঝের দিকে চাহিয়া সত্যবতী হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া চুপি চুপি কহিল, 'পা ধোবেন্ ত আপনি ? দাঁড়ান, জল এনে দিই।'

পণ্ডিত মশাই কহিলেন, 'ওই যা, দেখচ ত মা, কথায় কথায় আমার ভুল! বয়স হলো কিনা।'

জল আনিয়া সে পণ্ডিত মশাইয়ের পায়ে ঢালিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

মেজঠাকুর কহিলেন, 'আপনি তবে পূজোয় বসুন পণ্ডিত মশাই, আমি নীচে আছি। ন-বৌমা, তুমি থাকো এখানে, যদি ওঁর কিছু দরকার হয়।' বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

সত্যবতী স্তম্ভিত হইয়া ছাদের পাঁচিলের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল দুইজন দস্যু আসিয়া তাহার সর্বস্বধন ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লইয়া তাহাকে পথের ভিখারিণী করিয়া দিল। আর তাহার হাতড়াইয়া ধরিবার কোনো অবলম্বন নাই।

পেশাদার পূজারী ব্রাহ্মণ; আরতি ও পূজা করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। যথারীতি ঘণ্টা নাড়িয়া ফুল ফেলিয়া চন্দনের ছিটা দিয়া তিনি কাজ সারিলেন। মন্ত্রের অশুদ্ধ উচ্চারণ সত্যবতীর কানে আসিয়া তীরের মত বাজিতে লাগিল। পূজার পর প্রণাম সারিয়া বাহির হইয়া তিনি কহিলেন, 'ঠাকুরঘরের চাবিটা বুঝি তোমার কাছে মা ? দাও ত।'

সত্যবতী আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া দিল। দরজায় ছিল তালা লাগানো; পণ্ডিত মশাই ঘর বন্ধ করিয়া চাবিটা পৈতায় বাঁধিতে বাঁধিতে কহিলেন, 'মেজবাবু

বলে দিলেন চাবিটা আমারই কাছে···আমার আবার যে ঝঞ্ঝাট মা, হারিয়ে না ফেলি!' বলিয়া তিনি সাবধানে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন।

চন্দ্রালোকে যতদূর পর্যন্ত অস্পষ্ট দেখা যায় সত্যবতী সেইদিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু আজ মনে হইল তাহার জীবনের দূর ভবিষ্যৎ তাহার কাছে অস্পষ্ট নয়, দানবীয় হিংস্র নখর বাহির করিয়া সে-ভবিষ্যৎ তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ যে নারীর মন, তাহাদের প্রেম কেবলমাত্র ত চৌর্যবৃত্তি নয়, কেবল ত দেহ-বিলাসের কলঙ্ক নয়,—তাহাদের ভালবাসা মানে যে তাহাদের আমরণ পরমায়ু! বাধা পাইলে, আবর্তের আঘাত পাইলে নদীর বেগ হয় প্রবল এ কথা কে না জানে,—সত্যবতীর সমগ্র মন ওই দূর আকাশে অবাধ পক্ষ বিস্তার করিয়া ছুটিতে লাগিল একটি উদার চরিত্রের দিকে, যাহাকে সে চিনিয়াছে, অনুভব করিয়াছে, হৃদয়ের একান্ত অনুরাগে যাহাকে সে ভালবাসিয়াছে।

মালাটি গলায় দিয়া সে সিঁড়িতে নামিতেছিল পথে হইল প্রশান্তর সহিত মুখোমুখি। কেমন একটা অস্বাভাবিক সঙ্কোচে সে পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইতেই প্রশান্ত কহিল, 'বৌদি, শুনছি নাকি ঠাকুরের জন্যে বাইরের পূজারী নিযুক্ত করা হয়েচে?'

ভিতরের ব্যথাটা যেন ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া সত্যবতী কহিল, 'পুজোয় হয়ত ত্রুটি থেকে যাচ্ছিল আমার, এ ব্যবস্থা ভালই হয়েচে ঠাকুরপো।'

চক্ষু রাঙা করিয়া প্রশান্ত বলিল, 'তোমার পুজোয় ত্রুটি?' বলিয়া মুখের একটা শব্দ করিয়া সে ছাদে উঠিয়া আসিল।

কয়েক মুহূর্ত সত্যবতী স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপর সেও ছাদে উঠিয়া আসিয়া মিনতি করিয়া কহিল, 'এ নিয়ে তুমি যেন গোলমাল করো না ভাই।'

প্রশান্ত কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, ধীরে ধীরে কহিল, 'তোমার ঠাকুরকেই যদি আমরা কেড়ে নিলাম, তোমার রইল কি?'

'সব নিলেও মানুষের কিছু থেকে যায় ঠাকুরপো। আমার ঠাকুর যদি সত্যি হন তবে তিনি আমাকে ত্যাগ করবেন না।

'ত্যাগ তিনি তোমায় করেচেন বৌদি, কোনো মানুষের পরেই তাঁর আসক্তি নেই। দরজা খুলে দেখে এসোগে, তোমাকে ছেড়ে ওদের হাতে গিয়েও তোমার ঠাকুরের মুখে সেই হাসি, প্রসন্নতা, এক চুল এদিক ওদিক নেই। মানুষের ভক্তি-ভালবাসার পরে তাঁর অসীম ঔদাসীন্য, তিনি চান পূজার আড়ম্বর ভোগ-ঐশ্বর্য!'

সত্যবতী ম্লান হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। প্রশান্ত বলিতে লাগিল, 'তবু আমি জানি তোমার ঠাকুর কী তোমার কাছে, তুমি হয়ত এ আঘাত সইতে পারবে না; ওরা তোমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে নিল। তুমি অনুমতি কর বৌদি, তোমার অধিকার আমি ফিরিয়ে এনে দেবো।'

'না ঠাকুরপো। দাবি আমি করব না, সে বড লজ্জা। বলবানের হাত থেকে পূর্ব-অধিকার ছিনিয়ে আনতে গেলে তার উপযুক্ত হতে হয়। হাঁকাহাঁকি করে টানা-হেঁচড়া করতে চাইলে সে বড় অপমান।'

'তুমি কি তার উপযুক্ত নও?'

সত্যবতী কহিল, 'না।'

প্রশান্ত সহজেই বুঝিতে পারিল তাহার এ ইঙ্গিত কোন দিকে। কিন্তু সেদিকটাকে স্পর্শ করিবার সাহসও যেমন তাহার নাই, চক্ষুলজ্জাও তেমনি প্রবল।

ঠাকুরের আলোচনা শেষ হইবার পর মনে হইল আর তাহাদের কোনো কথাবার্তা নাই, আবার তাহারা দুইজনে দুইদিকে চলিয়া গেছে। ঘটনাচক্রে এই সংসারের সহিত আজ যে-ব্যবধান সত্যবতীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া নিকটতর হইয়া আসা যেন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এত বড় সমস্যা প্রশান্তর জীবনে ইতিপূর্বে আর দেখা দেয় নাই, কোথা দিয়া কেমন করিয়া ইহার প্রসঙ্গ তুলিয়া ইহার সমাধান করিবে তাহার কুল

কিনারা সে পাইল না। সত্যবতী তাহার সমবয়সী, বরং বছর খানেকের বড়ই হইবে, কিন্তু বড় হইয়াও সে অনেক বড়, আপন চরিত্রের গৌরবে জন-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া নিজের বয়সকে সে বহুদূরে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আজ তাহার চরিত্রের এই তথাকথিত ত্রুটি পরিবারের সকলের নিকট নিন্দিত হইলেও তাহার সমস্তই কি মিথ্যা? অথচ কেমন করিয়া প্রশান্ত আজ জিজ্ঞাসা করিবে, বৌদি, তোমার অভাবটা কোথায়! বিবেচনায়, দৃঢ়তায়, সংযমে, ত্যাগে যে-নারীটি তাহার চোখে চিরদিন দীপ্তিময়ী সে আজ একজন নগণ্য নারীর মত সামান্য হৃদয়াবেগে ও অনুরাগকে প্রশ্রয় দিল কেমন করিয়া?

সমাজ-বিরোধী ভালবাসার ভিতর এমন কী দুর্লভ বস্তু বৌদিদি পাইয়াছেন যাহার জন্য তিনি মুখ বুজিয়া লাঞ্ছনা সহিলেন, কলঙ্ক তুলিয়া লইলেন মাথার পরে, যাহার জন্য সংসারের এত বড় আসন হইতে বঞ্চিত হইয়াও তিনি দুঃখপ্রকাশ করিলেন না।

সত্যবতীই প্রথমে কথা পাড়িল। বলিল, 'তোমার তাহলে কলকাতাতেই থাকা স্থির হলো ঠাকুরপো?'

প্রশান্ত কহিল, 'কিছুই স্থির হয় নি। কলকাতায় সকলের মধ্যে সামাজিক হয়ে থাকতে আমার মন চায় না, নানা কারণে সে সম্ভবও নয়। পাটনায় একখানা দরখাস্ত পাঠিয়েছি, কি হয় দেখা যাক, কাজটা ভাল।'

সত্যবতী একটু হাসিল; বাস্তবিক আজ কেমন করিয়া যে তাহার মুখ দিয়া হাসি বাহির হইতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না, অত্যন্ত শিথিল ও প্রেরণাহীন হাসি,—হাসিয়া বলিল, 'সামাজিক হয়ে থাকতে না হয় তোমার মন চায় না, কিন্তু নানা কারণটা কী ঠাকুরপো?'

'সে কথা তোমার হয়ত ভাল লাগবে না বৌদি—' প্রশান্ত বলিতে লাগিল, "এদের সঙ্গে মনে মনে আমার বনিবনা নেই। এদের নিন্দে করিনে কিন্তু আমি এমনিই। এদের সঙ্গে বিবাদ করিনে, ভদ্র ব্যবহারই করি, কিন্তু আমিই

এদের সকলের চেয়ে বড় শত্রু। যে-প্রকৃতি এবং যে-মতলব নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি তার মধ্যে রয়েছে সর্বনাশা ধ্বংসের বীজ, সেখানে ক্ষমাও নেই, বিচারেরও অবসর নেই।'

সত্যবতী চুপ করিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিল।

'তুমি অনেক জানো বৌদি, তোমার কাছে ছোট হতে আমার লজ্জা নেই—' প্রশান্ত বলিয়া চলিল, 'কিন্তু এই অল্প জীবনে দেখেছি অনেক। দেশ-দেশান্তরে, দুর্গম-দুস্তরে, অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্ভোগে আমার যে-ইতিহাস লেখা হয়েচে তার পরিচয় আজকে দেবার দিন নয়; কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশের পথে পথে লক্ষ্য করেচি মানুষের যোগ্য মূল্য মানুষ কোথাও স্বীকার করে নি। মানব-চরিত্রের দুর্লভ দেবত্ব কোথাও বাধা পেয়েচে নীতিতে, কোথাও ধর্মে, কোথাও-বা এই সমাজের প্রচলিত সংস্কারে। শাসনে, উৎপীড়নে, লাঞ্ছনায় ভগবান বারে বারে মানুষের দাক্ষিণ্যের দরজা থেকে কেঁদে ফিরে গেচেন; ক্ষুধায় অন্ন পাননি, পিপাসার জল পাননি। আমি আঘাত করতে চাই সেইখানে যেখানে এদের সকলের চেয়ে বড় আশ্রয়।'

'তাহলে এ তোমার ধর্মযুদ্ধ বল ?'

'না' এ যুদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে, ধর্মের শাসনের বিপক্ষে। দরিদ্র যেখানে পরেচে রাজার ছদ্মবেশ, অপমান যেখানে বসেচে বিচারের উঁচু আসনে, উদ্ধত অন্ধ দুর্নীতি যেখানে হাতে নিয়েচে সমাজ-ব্যবস্থার ভার, আমার প্রতিবাদ তাদের বিরুদ্ধে। বৌদি, তুমি জানো জাতির পক্ষে সে কী ভয়ানক দুর্দিন, ধর্মের নামে মানুষ যখন মানুষের মনুষ্যত্বকে টুঁটি টিপে মারে; তুমি জানো, নরনারীর নিরাশ্রয় ভালবাসা সমাজপতির নির্দয় লাঞ্ছনায় কেমন করে' পথের ধূলোয় উপবাস করে' মরে ?'

প্রশান্তর দীপ্ত চক্ষুর দিকে তাকাইয়া সত্যবতী কম্পিত কণ্ঠে কহিল, 'জানি ঠাকুরপো।'

পায়ের শব্দ পাইয়া দুইজনেই চকিত হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। অস্পষ্ট

চাঁদের আলোয় সেইদিকে তাকাইয়া প্রশান্ত ক হল, 'ফিরে যাচ্চিস কেন রে টুনি, কি চাই ?'

টুনি বোধ করি নিঃশব্দে আসিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল, 'মাকে খুঁজতে এসেছিলাম ছোটকাকা।'

রাত হইয়া গিয়াছিল। সত্যবতী কহিল, 'ওঠো ঠাকুরপো, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়োগে।'

প্রশান্ত কহিল, 'তোমার হয়ত ভাল লাগল না বৌদি, কেমন ?,

সত্যবতী কহিল, 'বলা কঠিন ঠাকুরপো, মেয়েদের মন একটা পথ ধরেই হাঁটে, তাদের সকল চিন্তাই বিশেষ একটা জারক রসে ভিজানো,এই রসটার দাম বিশিষ্ট মেয়েলি প্রকৃতি। কোথায় ভাল লাগল আর কোথায় লাগল না—এ কথা আমার নিজেরই কাছে পরিষ্কার নয়। তবু খুশী হয়েচি আমি তোমার কথায়, তোমার মধ্যেই রয়েচে আমার অন্তরঙ্গ। এবার মনে হচ্ছে আমি নিতান্ত একা নয়।'

প্রশান্ত কহিল, 'আমিও তোমায় পেয়েছিলুম বৌদি, এক দুর্লভ মুহূর্তে। তুমি বসেচ আমার মায়ের শূন্য আসনে, তোমার মধ্যে দেখেচি আমার স্নেহময়ী বড় বোনকে—এমন কথা বলেই ক্ষান্ত হব না ; তুমি এদের সকলের থেকে আলাদা। যে সম্মান তুমি এদের কাছে অর্জন করেছিলে সে কেবল তোমার চরিত্রের গৌরব নয়, ব্যক্তিত্বের মহিমা—'

'সে সব আজ মিথ্যা হয়ে গেছে ঠাকুরপো।'

'তাইতেই ত আমার আনন্দ বৌদি'—প্রশান্ত বলিতে লাগিল, 'তারা মিথ্যা হয়নি, কুয়াসায় ঢাকা পড়ে না সূর্যের আলো, মিথ্যা হয়েচে সেই বস্তু সত্যের পরীক্ষায় টিকে থাকা যার পক্ষে অসম্ভব। আজ তুমি জানতে পেরেচ বিচারবুদ্ধিহীন স্তাবকতার পিছনে জনসাধারণ কোথায় আপন স্বার্থের প্রয়োজনকে লুকিয়ে রাখে। শ্রদ্ধা তাদের কী ক্ষণভঙ্গুর, তাদের স্নেহ-মমতার মূল্য কতটুকু !

কিয়ৎক্ষণ তাদের নীরবে কাটিয়া গেল। চন্দ্রালোকে সারা আকাশ ধব ধব করিতেছে, সুন্দর বসন্ত রাত্রি।

'তুমি আমাকে বল্‌বে ঠাকুরপো একটি কথা?'

প্রশান্ত তাকাইল তাহার মুখের প্রতি। সত্যবতী কহিল, আলাদা করেই যখন আমাকে দেখতে পেরেচ, তুমি বল ত, আমি কোন্ পথে চলেচি?

'বলবার আমার সাধ্য নেই বৌদি—' প্রশান্ত কহিল, 'মানুষ নিজের পথে চল্‌বে চিরদিন, আপন জ্ঞানের আলোয় ও অভিজ্ঞতার ইঙ্গিতে যে-পথ নিজে সে আবিষ্কার করেচে, সেখানে অন্যের নির্দেশ নেই। ঝড়ে ঝঞ্ঝায় দুর্যোগে সে বাধা পায়নি; নিষেধ প্রতিবাদে বিপদে সে পিছন ফিরে তাকায়নি,—তার চিরদিনের অভিসার আপন আদর্শের দিকে।'

'সে-আদর্শ অন্যায়ও ত' হতে পারে ঠাকুরপো।'

'তা পারে, কিন্তু সে তার নিজের। সমস্ত ন্যায় অন্যায় নিয়েই তার হয় পরিপূর্ণ বিকাশ। পঙ্কিল আবর্তের ভিতর থেকে আহরণ করে সে প্রাণলীলার বীজ, তারপর একদিন উদার আকাশের দিকে সে শতদল মেলে জেগে ওঠে। জীবনকে সহজ করে ছেড়ে দেওয়াই মানুষের সাধনা। তোমার পথ রয়েচে তোমার মনে।'

নানা আলাপের পর অনেক রাত্রে তাহারা নীচে নামিয়া আসিল। বিদায় লইয়া প্রশান্ত চলিয়া গেল নিজের ঘরে।

৫

সকাল বেলা বাড়ীর মাষ্টার মশাই পড়াইতে আসিয়াছিলেন। চলিয়া যাইবার সময় তিনি মণ্টুকে ভিতর-দরজার নিকট আনিয়া কহিলেন, 'ন-বৌদিদি আছেন এখানে ?'

সত্যবতী কুটনো কুটিতে বসিযাছিল। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া কহিল, কেন মাষ্টার মশাই ?'

'এই দেখুন, মিণ্টু বড় অবাধ্য হয়েছে। দু'দিন ধরে টাস্ক দিচ্ছি, কিছুই করে না, কেবল ফাঁকি দেয়। একটু দেখবেন একে।'

মাষ্টার মশাই চলিয়া যাইবার পর সত্যবতী কহিল, 'মিণ্টু তোমার বিস্তে দিন দিন বাডচে, কেমন ?'

মিণ্টু তাহার ন-খুড়িমার দিকে তাকাইয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। এমন সময় কোথায় ছিল টুনি, ঝপাৎ করিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল, এবং টান মারিয়া মিণ্টুকে ছিনাইযা লইযা কহিল, 'তুমি শাসন করবার কে ন-খুড়িমা, নিজের ছেলে নেই বলে পরের ছেলের ওপর এত রাগ ? আয় মিণ্টু—' বলিয়া মিণ্টুকে লইয়া সেদিনকার দশ বছরের মেযে টুনি সকলকে স্তম্ভিত করিযা দিয়া চলিযা গেল।

উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন টুনি ও মিণ্টুর মা মেজবউ। এ-বাড়ীতে তাঁহার ছেলেপুলের সংখ্যাই সকলের চেয়ে বেশি। তিনি কহিলেন, 'ধমক খেয়ে খেয়ে বাছাদের হাড় ক'খানি সার। তুমি এখন থেকে নিজেকে সামলাও ন-বৌ শাসন করতে হয় নিজেকে কর।'

সত্যবতী অবাক হইয়া দাঁড়াইযা ছিল। ইন্দুবালা ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বারান্দার দিকে তাকাইয়া কহিল, 'আজ বুঝি মেজদির মুখ ছোটাবার পালা ?'

'তুই থাম্ সেজবৌ, ছিলি কোথায় এতক্ষণ? এ-বাড়ীতে মানুষ নেই তাই, নৈলে কোন ভদ্দরলোকের বাড়ীতে এমন বেহায়া পানা চলে বল দিকি?

মেজবউয়ের মুখের ধার সুপরিচিত। ছেলে-মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল, নীচে ঝি-চাকর-বামুন তটস্থ, ওদিকের ঘর হইতে বড়বউ বাহির হইয়া আসিলেন। তাহার দিকে তাকাইয়া মেজবউ ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, 'থাকুন বটঠাকুর, চুপ করে রয়েচি আজ পাঁচ বছর, চোখে যে কাঁটা ফোটে বড়দি; হাজার হোক মাষ্টার মশাই বাইরের লোক, তাঁর সঙ্গে অমন ঢঙে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে দু'ঘণ্টা কথা বলা,—তুমি না এ-বাড়ীর বউ? লজ্জায় যে আমাদের মাথা কাটা যায়।'

সত্যবতী মুখ তুলিয়া কহিল, আপনার একথা সত্যি নয় মেজদিদি।'

'সত্যি আমার কিছুই নয়, সব সত্যিই তোমার, গা জ্বলে যায়; ছাতে বসে দেওর-ভাজে যে আর্ধেক রাত পর্যন্ত হাসিখুসি হয় সেও আমার মিথ্যে বল?'

'না সে কথা মিথ্যে নয়। ঠাকুরপো আমার কাছে বসে রোজই কথাবার্তা কন।' সত্যবতী কহিল।

'সে আমি খোঁজ রাখি ন-বৌ। কিন্তু আর কেন, নিজের পরকালটি খেয়েচ, এখন আর ওই মা-বাপমরা ছেলেটার মাথা খাও কেন! শিবতুল্য দেওর আমাদের।'

ঝি-চাকরের সম্মুখে এই অপমানে মুখখানা তাহার কালি হইয়া গেল। কথায় কথা বাড়িবে, সুতরাং আর কিছু না বলিয়া সত্যবতী পুনরায় গিয়া ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিল।

বড়বউ নীচে নামিয়া আসিলেন। সেজঠাকুর 'কলঘর হইতে স্নান করিয়া বাহির হইয়া বলিলেন, 'সব আলাদা-আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত' বুঝলে বড়-বৌ?'

'কে আর কা'র গায়ে লেপ্টে আছে, তোমার আবার এক বেমক্কা কথা,—যাও, নিজের কাজে যাও।'

'বেশ' তবে যা খুসি কর,—এসব কি বড়দার কানে ওঠা ভাল?' বলিয়া বিপিন গুন গুন করিয়া গান ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। এ-বাড়ীতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁহার মতামতের মূল্য কেহ দেয় না। অফিস হইতে ফিরিয়া তিনি হারমোনিয়ম্ লইয়া বসেন, এবং কোনো কোনো দিন বাহির হইবার সময় উল্টা জুতা পায়ে দিয়া নির্বিবাদে চলিয়া যান।

ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া কি একটা খুঁজিবার নাম করিয়া বড়বউ বলিলেন, 'ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছিল ছুদিন, আজ সকালে আবার বেড়ে উঠল। দিন-কাল খারাপ, ভেবে মরচি—কই, কড়াখানা গেল কোথায়, একটু সাবু চড়িয়ে দিই।'

বড়ঠাকুরের জ্বরের কথা সত্যবতী শুনিয়াছিল। কেমন আছেন তিনি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সকালবেলা উঠিয়াই তাঁহার দরজা পর্যন্ত সে গিয়াছিল কিন্তু ভিতরে ঢুকিতে সাহস হয় নাই। উঁকি দিয়া তাঁহার পা ছু'খানি দেখিয়াই তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। বড়দিদির কথা শুনিয়া সে একবার মুখ তুলিয়া তাকাইল, তারপর নিঃশব্দে মাজা কড়াখানা ও সাগুর কৌটা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া আবার আসিয়া বসিল।

বড়বউ সেগুলি লইয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে শুনাইয়া বলিয়া গেলেন, 'ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা না করলে ত আর চলবে না।'

তাঁহার বলিবার আগেই সত্যবতী ঠিক করিয়া লইয়াছে কোন্ ডাক্তারকে পাঠানো উচিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিলে পাছে তাহার প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যাত হয় এজন্য ভয়ে ভয়ে সে চুপ করিয়া রহিল। মেজকর্তা ছাড়া আর কাহারো ব্যবস্থা অতঃপর এ-বাড়ীতে চলিবে না।

যাহা হউক, সেদিন যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা হইল। জ্বরের জাতটা ভাল নয়।

সংসারের শৃঙ্খলায় কোথায় যেন পদে পদে একটা অনৈক্য থাকিয়া যাইতেছে। যে দায়িত্ব সত্যবতীর স্কন্ধ হইতে অপসারিত হইল, সে-দায়িত্ব সম্পূর্ণ কে যে গ্রহণ করিয়াছে তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছিল না। ঝি-চাকর-বামুন আর তাহার নিকট জবাবদিহি করিতে আসেনা, উপদেশ নেয় না,—তাহাদের এই বিচিত্র ব্যবহারটাই সত্যবতীর সম্মান-বোধে খোঁচা দিতে লাগিল। ইহাদের এই দুঃসাহস ও স্পর্ধার পিছনে আছে কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয়, ইহা সে জানে,—তাই ভিক্ষা করিয়া সম্মান আদায় করিতেও তাহার ঘৃণা হইতেছিল।

কিন্তু হাসি পাইল তখন, এ-বাড়ীর ছেলেপুলেদের সে যখন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে দেখিল। যে বালক-বালিকারা বাল্য হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে কৈশোরের পথে, যাহারা তাহার প্রাণের প্রিয়, বিদ্বেষ ও মালিন্যের সহিত যাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, আজ সত্যবতী বুঝিল তাহারা আর তেমনটি নাই। আজ তাহারা কেমন করিয়া জানি না, বিস্ময়করভাবে পিতামাতার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, ন-খুড়িমা নামক কোনো গুরুজন যে এ-বাড়ীতে আছেন তাহা ভ্রূক্ষেপ করিয়াও একবার তাহারা দেখিতে চায় না। সত্যবতী স্নেহের হাসি হাসিয়া তাহাদের এই অপূর্ব ঔদাসীন্যকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

দ্বাদশীর দিন সকাল বেলাটায় বড়বউ আসিয়া তাহার রান্নাবান্না এবং জলযোগের যোগাড় করিয়া দেন, এই নিয়মটাই এতকাল চলিয়া আসিতেছে। আজ বড়ঠাকুরের রোগশয্যার নিকট হইতে তিনি উঠিয়া আসিতে পারেন নাই, সত্যবতী কোনোমতে অতি সংক্ষেপে রান্নার আয়োজন করিয়া একধারে বসিয়াছিল। এমন সময় পাশের বাড়ীর নতুন-বৌ আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কহিল, 'ছোট মেয়েটার পেটের ব্যামো, একটু একটু জ্বর, কি খাওয়াই বল ত ন-বৌদি?"

সত্যবতী কহিল, 'তবে ওষুধ একটু দিই, কেমন? এই দু'মিনিট, তরকারীটা চড়িয়ে দিয়েই—'

তরকারী চড়াইয়া উপর হইতে বিধিমত ঔষধ আনিয়া সে যখন নতুন-বৌয়ের হাতে দিল, কলঘর হইতে বাহির হইয়া মেজঠাকুর তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নতুন-বৌ আর দাঁড়াইল না, ঘোমটা টানিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। গামছাখানা নিংড়াইয়া কাঁধে ফেলিয়া যোগীন কহিলেন, 'বড়বউ আছ নাকি এদিকে ?'

বড়বউ এদিকে ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজে উপরের বারান্দা হইতে ইন্দুবালা গলা বাড়াইল। সত্যবতী ভিতরে বসিয়া দুরু-দুরু বক্ষে বাহিরের দিকে তাকাইল।

বড়বউকে না পাইয়াও যোগীনের কোনো অসুবিধা হইল না। তিনি স্পষ্টকণ্ঠে কহিলেন, 'ন-বৌমাকে জানিয়ে দাও যে, এটা দাতব্য-চিকিৎসালয় নয়, এটা গেরস্থ ঘর। বিনামূল্যে উনি ওষুধ লোককে বিলাতে পারেন, কিন্তু ওষুধটা পাওয়া যায় না বিনামূল্যে, তার দাম যোগাতে হয় আমাদের সারাদিন পরিশ্রমে।'

কোথায় ছিলেন বিপিন, তিনি বারান্দায় দাঁড়াইয়া ফস্ করিয়া কহিলেন, 'কিন্তু ওঁর মাসহারার টাকাটা মেজদা ?'

যোগীন মুখ তুলিয়া কহিলেন, 'শুনেছি সেটা উনি ব্যয় করেন মেয়ে-মহলে। তা করুন, আমার কেবল বক্তব্য এই যে, ওঁর খাইখরচাটা সম্বন্ধে যেন উনি একটু অবহিত হন, সেটা যোগাতে হচ্ছে আমাদের। ওঁর কাপড়-চোপড়, বিলাস-ব্যসনের ব্যয়ভার ত সামান্য নয় বিপিন।'

বিপিন কহিলেন, 'এ সমস্ত বড় অন্যায়। মেয়েদের খরচপত্র মেয়েরাই করবেন এখন থেকে।'

ওকি তোমার কথার ছিরি সেজ ঠাকুরপো ?' বলিতে বলিতে মেজবৌ বাহির হইয়া আসিলেন,—'মেয়েরা নিজেদের খরচপত্র করবে কোত্থেকে শুনি ? তাদের কি সরকারি মাসহারার বন্দোবস্ত আছে, না তাদের আলাপ আছে কোনো লোকেদের সঙ্গে ?'

বিপিন কহিলেন, 'তা ত বটেই, সেই জন্যেই ত বল্‌ছি, ন-বৌমা কোথায় পাবেন খরচপত্র—'

ইন্দুবালা তাহার এই হ্রস্ব দীর্ঘজ্ঞানশূন্য স্বামীটিকে টানিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেল, হাসিয়া বলিল, 'অল্পবুদ্ধিকে নিয়ে সংসার করা চলে কিন্তু নির্বুদ্ধিকে নিয়ে ঘর করা চলে না।'

বাহিরে মেজবউয়ের ঝঙ্কার শোনা যাইতেছিল, 'কথা যখন উঠ্‌লই তখন আমাকেও বলতে হলো। বাপের বাড়ী থেকে ন-বৌ কত টাকা এনেছিল শুনি? স্বামী-পুত্তুর নেই, বিষয়েরই বা ভাগ পাবে কোন্ আইনে? আদালতে গিয়ে যদি খোরপোষের দাবি দিয়ে নালিশ করে, আমরাও সেই চিঠি নিয়ে গিয়ে পেশ করব, মামলা যাবে ফেঁসে, দেশময় শুন্‌বে ওঁর চরিত্রের কথা।'

স্ত্রীর এই অপ্রিয় সত্যভাষণ শুনিয়া যোগীন মনে মনে খুশী হইলেন। বলিলেন, 'সে আর আজ নেই, তুমি চুপ করে যাও; কিন্তু আজ থেকে এই কথা ন-বৌমাকে জানিয়ে দাও, দাতব্যের দরজা উনি বন্ধ করে দিন্, মাসোহারার টাকা এবার থেকে ওঁর হাতে থাকবে না,—আর ওঁর ব্যক্তিগত খরচপত্র সম্বন্ধে—'

এমন সময় উপরে বড়বউ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'শীগ্‌গির আয় তোরা গো, কর্তার মাথায় লেগে গেছে—'

হাত হইতে সত্যবতীর খুন্তি পড়িয়া গেল। বড়বউয়ের চীৎকারে যে-যেখানে ছিল উপরে উঠিয়া আসিল। কেদারবাবুকে ধরিয়া বড়বউ তখন দরজার গোড়ায় বসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মাথা কাটিয়া গিয়া বড়বউয়ের কাপড়-চোপড় রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে।

কেদারবাবুর একে রুগ্ন অবস্থা, তাহার উপর এই আকস্মিক বিপদ; মাথার চুলের ভিতর দিয়া রক্তের ধারা নামিয়া কানের পাশ দিয়া গড়াইতেছে। চোখ বুজিয়া বড় বউয়ের কাঁধের উপর ভর দিয়া তিনি কাৎ হইয়া আছেন।

যোগীন ক   'কেন করে লাগ্‌ল বড়বউ ?'

'সে কথা পরে শুনো, আগে ডাক্তারকে খবর দাও—'

নীচে সত্যবতী একটা চাকরকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটাইয়া ডাক্তারকে আনিতে পাঠাইল; ডাক্তার নিকটে থাকেন। পরে বাল্‌তি করিয়া জল লইয়া সে উপরে গিয়া তাঁহাদের কাছে রাখিল, দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিয়া যাহা হাতের কাছে পাইল—একখানা ধোপদস্ত কাপড় ছিঁড়িয়া ন্যাকড়া আনিল। আনিয়া বড়দিদির হাতের কাছে দিল।

বড়বউ চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন, 'হবে না, দিনরাত তোমাদের কিচ্‌কিচ্‌, অপঘাত একটা হবে না ? ন-বৌয়ের আজ দ্বাদশী, সকাল থেকে মুখ বুজে নিজের কাজ নিয়ে আছে, তোমাদের গলার আওয়াজে কাক-চিল বস্‌তে পায় না ; উনি আসছিলেন থামাতে। রোগা শরীর, টাল্‌-সামলাতে পারলেন না, দরজায় মাথা ঠুকে এই সর্বনাশ !'

'দোষ ত তুমি আমাদেরই দেখবে বড়বউ।' যোগীন মুখ অন্ধকার করিয়া কহিলেন। পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন মেজগিন্নি, তিনিও মুখ বিকৃত করিয়া সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন।

এমন সময় আসিয়া পড়িল প্রশান্ত ; এই আকস্মিক বিপদপাতে হতচকিত হইয়া সে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইল, তারপর বড়বউয়ের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া কেদারবাবুকে বিছানার উপর তুলিয়া আনিল। কেদারবাবু চোখ বুজিয়া অর্ধচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

ডাক্তার আসিয়া ব্যাণ্ডেজ্‌ বাঁধিলেন। ঔষধ-পথ্যের নূতন ব্যবস্থা হইল। কোনোরূপ উত্তেজনা হইলে পুনরায় রক্তস্রাব হইবার সম্ভাবনা—একথাও জানাইয়া গেলেন। বড়বউয়ের সহিত প্রশান্ত ও সত্যবতী তাঁহার অবিশ্রান্ত সেবায় লাগিয়া গেল।

একেই ত ষাটের উপরে বয়স হইয়াছে, শরীরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে নানা ছোটখাটো রোগ, ভগ্ন জীর্ণ দেহ,—তাহার উপর এই আঘাত,—

কেদার বাবুর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। কথা আর তিনি বলেন না, সত্যবতী স্মরণ করিতে পারে কবে হইতে তাঁহার কথা প্রায় বন্ধ হইয়াছে,—কখনো জ্ঞান কখনো আচ্ছন্ন, কখনও বা এমন কথা বলিয়া উঠেন যাহার কোনো সামঞ্জস্য নাই। ডাক্তার যাতায়াত করিতেছেন, প্রতিদিন ঔষধপত্র বদল হইতেছে, মাথার ক্ষত একটুও শুকাইতেছে না—এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। বাড়ীতে একটি আসন্ন বিপদের ছায়া নামিয়াছে। সত্যবতীর বুক দুরু দুরু করিতে থাকে।

পাড়ার লোকেরা অনেকেই এই ভদ্র মানুষটির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যায় বটে কিন্তু দুপুর বেলায় মেয়েরা আর আসে না। যোগীনবাবুর কটু-কাটব্য তাহাদের পর্যন্ত ক্ষমা করে নাই। সেদিন শিবানী আসিয়া এমন কথা শুনিয়া গেছে যাহা অন্য কেহ হইলে ক্ষমা করিত না। সে-কথাটা সত্যবতী এবং তাহার সঙ্গিনীদের সম্বন্ধে। এমন হীন এবং অমার্জনীয় মনোভাব কেমন করিয়া কবে এই পরিবারে জন্মলাভ করিল, তাহার কোনো কুল-কিনারা পাওয়া গেল না। কিন্তু না পাইলেও ক্ষতি নাই, ঘরের লোকে যখন এমনি করিয়া বলিতে সুরু করিয়াছে, তখন সে সকল কথা কানাকানি হইয়া যে পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া যাইবে তাহা কিছু বিচিত্র নয়। চরিত্রের গৌরব লইয়া যাহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাহাদের দুর্ভাগ্য, তাহাদের চরিত্রের দুর্ণাম শুনিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ অত্যন্ত বেশী। সুতরাং অতি সহজে নানা কথার সৃষ্টি হইতে লাগিল, মুখে-মুখে এখানে-ওখানে ফিরিতে লাগিল, সত্যবতীর সম্বন্ধে নানা মন্তব্য ও ধারণা, এবং অবশেষে সেগুলি প্রতিধ্বনিত হইয়া এ-বাড়ীর কর্তাদের কানেও আসিয়া পৌছিল। সেগুলি কেবল আজগুবি ও অবিশ্বাস্য নয়, অরুচিকর এবং কদর্য। সত্যবতীর ছদ্মবেশ যেন আজ সকলের চক্ষেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই বিপদের মধ্যেও বড়বউ পর্যন্ত সে সব শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন, ইন্দুবালা স্তম্ভিত হইয়া গেল, প্রশান্তর মুখে

আর কথা যোগাইল না, এবং পরিশেষে একদিন অস্থির হইয়া বিপিন গিয়া পাড়ার চাটুয্যে মশায়ের সহিত বিবাদ করিয়া আসিলেন। ঘরের ভিতর থাকিয়া সত্যবতীর যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তাহার সহিত শত্রুতা করিতে সুরু করিয়াছে।

এদিকে কেদারবাবুর অবস্থা খারাপ হইয়া দাঁড়াইল।

বিপদের দিনে সংসারে আসিল বিশৃঙ্খলা, কেহ আর কাহারো দিকে তাকায় না। কখন কোন্ অতর্কিত মুহূর্তে মৃত্যু আপনার পাওনা চুকাইয়া লইতে আসিবে তাহার কোন ঠিক নাই। একথা কেমন করিয়া যেন চারিদিকে প্রচারিত হইয়া গেছে, এই মৃত্যুই জন্য দায়ী একমাত্র সত্যবতী।

'বললে হয়ত ভাল শোনাবে না, বড়বউ হয়ত রাগ করবেন—যোগীন বলিতে লাগিলেন, 'কিন্তু একথা ঠিক, ধর্মের ঘরে পাপের বাসা হয়েচে। যারা নিরপরাধ তারা সইতে পারে না অন্যায়ের আঘাত, তারা ধ্বংস হয়।'

যাহার মুখ হইতেই বাহির হউক, এ কথা কি মিথ্যা? পাপ ঢুকিয়াছে সংসারে, মৃত্যু দিয়া কি তাহার মূল্য শোধ করিতে হইবে? যোগীনের উক্তির ভিতর কোথায় যেন একটি সত্যের বীজ লুকানো ছিল, সকলের মনে একটা নিষ্ঠুর সন্দেহ আনিয়া দিল। প্রশান্ত, বড়বউ এবং ইন্দুবালা মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল,—সত্যবতীর সম্বন্ধে কোথায় যেন তাঁহাদের মনে একটি ভীতি জন্মিল। যোগীন হয়ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইতে পারেন কিন্তু তিনি সংগ্রাম করিতেছেন ন্যায় ও নীতির পক্ষে, ধর্ম ও বিবেকের পক্ষে,—তাঁহার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির পরে আছে একটি আদর্শের দৃঢ়তা, মনে তেজস্বিতা। যোগীনের মতামতকে আর উপেক্ষা করিয়া থাকা যায় না। প্রশান্তর কানে কেবল বাজিতে লাগিল, যারা নিরপরাধ তারা সইতে পারে না অন্যায়ের আঘাত, তারা ধ্বংস হয়।

এই বিপদটাই সকলের চেয়ে বড়। যে-অবলম্বন সর্বাপেক্ষা দৃঢ় তাহাই যখন দুর্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয় তখন আর কোথাও আশ্রয় নাই। স্রোতের

পরে যেমন ভাসিয়া চলে খড়ের কুটা সত্যবতীর অবস্থাটা হইল তদ্রূপ। হাত বাড়াইয়া আর কিছুই নাগালের মধ্যে পাওয়া গেল না।

চোখের ভিতরে তাহার জল জমা আছে কিন্তু কাঁদিতে ঘৃণা হইল। অশ্রুর মধ্যে থাকে দৈন্য, একটি অন্ধ অসহায়তা। 'যেখানে অনুশোচনা, যেখানে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন, বিচ্ছেদ ও বেদনায় অন্তর যেখানে কালবৈশাখীর ঘনঘটায় আবিল, তাহাদেরই পথ ধরিয়া আসে অশ্রুর অনর্গল ধারা; কিন্তু সত্যবতার সে-পথ নয়। এমন কথা তাহার মনে আসিল না যে, সে কোনো অস্বাভাবিক অপরাধ করিয়াছে। আপনার মধ্যে দুষ্কৃতির মালিন্যও যেমন সে অনুভব করিল না, তেমনি স্পষ্ট হইয়া রহিয়া গেল একটি সহজ বিশ্বাস। দুঃখের আগুনে পুড়িয়া সে কঠিন হইতে লাগিল।

কেদারবাবুর ঘরে আর তাহার ঠাঁই হইল না। এ-বাড়ীর সকলে যেখানে সমবেত হয়, সেখানে থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘর হইতে বারান্দায়, বারান্দা হইতে কোনো অদৃশ্য আশ্রয়ে; ছায়া হইয়া সে যেন বিস্মরণের আবছায়ার পথে ধীরে ধীরে মিলিয়া যাইতে লাগিল। রোগীর ঘরে আগে তাহার প্রয়োজন হইত, সে-প্রয়োজন তাহার ফুরাইয়াছে। পাছে কোনো অছিলায় তাহাকে আসিতে হয় এজন্য পূর্বাহ্ণে সবাই সতর্কতা অবলম্বন করেন, তাহাকে এড়াইয়া চলাই ইঁহাদের কাজ। রোগীর সম্বন্ধে আলোচনা ও কুশল তাহাকে জানাইবার কোনো দরকার নাই, ডাক্তারের মন্তব্য ও উপদেশও তাহার কানে আসিয়া পৌঁছায় না, পথ্য ও অন্যান্য আয়োজনের ভারও তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছে। এ শুধু তাহার পক্ষে অপমান নয়, তাহার প্রতি বিরক্তি নয়—নির্দয় তাচ্ছিল্যে তাহাকে দূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যিনি তাহার সকলের চেয়ে আপন, সর্বাপেক্ষা পূজনীয়,—তাঁহার নিকট হইতে তাহাকে দূরে রাখার এ একটি ষড়যন্ত্র। যে বড়ঠাকুরের সেবা করিবার অধিকার তাহারই সর্বপ্রথম, তাঁহাকে চোখে দেখিবার পথটুকু পর্যন্ত তাহার লুপ্ত হইয়া গেল।

তা যাক্, জীবনে এমনিই হয়। যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু মানুষের কাম্য

তাহা হইতে নিঃশেষে বঞ্চিত হওয়াই নিয়তির ইঙ্গিত। সত্যবতী দুঃখ করিবে না, ব্যথা জানাইবে না, চোখের জল ফেলিবে না। হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ করিয়া সে এই অপমানকে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবে না। আকাশের যেখানে অসীম বিস্তার, যেখানে সে উদার ও নির্মল, সেখানেই দেখা দেয় দুর্যোগের মেঘ, সেইখানেই চলিতে থাকে বজ্রাঘাতের খেলা। সত্যবতী আপন অন্তরের পরিব্যাপ্তির মধ্যে সকল দুর্যোগ ও আঘাতকে সহ্য করিবার শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে।

ছাদে আসিয়া সে দেখিল কৃষ্ণপক্ষের দিকব্যাপিনী অন্ধকার দূর শহরের মালিন্যময় লোকালয়গুলির পরে আসন পাতিয়া নিঃশব্দ নীরবে তপস্যায় বসিয়াছে। সত্যবতী আসিয়া ঠাকুর-ঘরের সুমুখে দাঁড়াইল, দেখিল, নিয়মিত দরজায় তালা বন্ধ,—একটু আগে পণ্ডিত মশাই কখন্ আসিয়া বোধকরি আরতি সারিয়া গিয়াছেন। জানালা নাই, শুধু একটিমাত্র দরজা, কোথাও ফাঁক দেখা যায় না। শিকলের তালাটা উদ্ধত হইয়া তাহাকে যেন চোখ রাঙাইয়া উঠিল। সত্যবতী চৌকাঠের কাছে বসিয়া গলার রুদ্রাক্ষের মালা খুলিয়া জপ করিতে বসিয়া গেল।

দুইটি মুদ্রিত তাহার চক্ষু, অতি মৃদু তাহার অঙ্গুলিচালনা, কোমল সেগুলির ভঙ্গী, মাথায় ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুলগুলি কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে,—জপ করিতে করিতে সে যেন সমুদ্রের তলায় ডুবিয়া যায়।

সেদিন তাহার জপ আর শেষ হইতে চায় না। শেষ যখন হইল তখন চারিদিকে নিশুতি হইয়াছে। মালাটি গলায় দিয়া সে বন্ধ দরজার চৌকাঠের পরে একটি প্রণাম করিল। চোখ দুইটি সে যখন খুলিল তখন সে-চক্ষু নিবিড় বৈরাগ্যে ভরা, তাহাতে একটি অনির্বচনীয় আনন্দের ছায়া, সে বৈরাগ্যের পরে আছে মানুষের প্রতি একটি অপরিসীম মমতা। তন্দ্রায় তাহার চক্ষু দুইটি জড়াইয়া আসিল।

সে দরজার গোড়ায় শুইয়া মনে মনে কহিল, 'হে ঠাকুর, আজ এই মরণাপন্ন

জীবনটিকে ভিক্ষা দাও। মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তা জানি, আমরা সবাই একটি পরম ইচ্ছাশক্তির ক্রীড়নক তাও মানি, তবু আজ একটি প্রাণ আমাকে ভিক্ষা দাও। আমার জীবনের এই অকারণ ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু এনে দিয়ে তোমার লীলার অনন্ত রহস্যের অন্ধকারে আমাকে অন্ধের মত টেনে নিয়ে যেয়ো না। হে প্রসন্নময়, আমাকে মুক্তি দাও।'

মুক্তি তিনি দিলেন।

গতরাত্রে কখন্ তাহার তন্দ্রা আসিয়াছিল, কখন্ ভাঙ্গিয়াছিল ঘুম, কখন্ নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া সে নিজের ঘরে ঢুকিয়াছিল তাহা তাহার কিছুই মনে নাই। প্রভাতে উঠিয়া শুনিতে পাইল বড়ঠাকুর ভাল আছেন। রাত্রে তাঁহার বেশ ঘুম হইয়াছিল, প্রত্যুষে জাগিয়া বড়বউয়ের সহিত কথা বলিয়াছেন, মাথার ঘা তাঁহার একটু ভাল আছে।

অধীর আগ্রহ দমন করিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। একটু বেলায় ডাক্তার আসিলেন, সবাই ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ঘরের নিকটে গিয়া কিছু শুনিবার উপায় নাই। মিনিট্ পনেরো পরে তিনি যখন নীচে নামিয়া চলিয়া গেলেন তখনো কিছু শোনা গেল না। কিন্তু বাতাসে ভাসিয়া এই কথাটাই তাহার কানে আসিয়া বাজিল, ভয় কাটিয়া গেছে।

আকাশ তাহার চোখে আবার সুন্দর হইয়া উঠিল। নিশ্বাস লইবার মতো বাতাস চলাচল করিতে লাগিল, দুর্যোগের অমানিশায় তাহার ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত দৃষ্টির সম্মুখে মেঘমালার ভিতর দিয়া রৌপ্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

দুইদিন পরে জানা গেল, কেদারবাবু সুস্থ হইবার পথে চলিয়াছেন। আনন্দে সে হাত-পা ছড়াইয়া চলাফেরা সুরু করিল।

আঃ এমন পায়ে পায়ে ঘুরো না ন-বৌমা, বেরোবার সময় তোমার একটু আড়ালে-আবডালে থাকা উচিত।' পিছন হইতে যোগীনের ধমক খাইয়া সত্যবতী তটস্থ হইয়া সরিয়া গেল।

মেজগিন্নি বলিয়া উঠিলেন, 'বিশ দিন বলেচি তাড়াতাড়ি পুরুষ মানুষের

বেরোবার সময় একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। বারান্ দিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ানো কী মতলবে? এই গাড়ী ঘোড়ার রাস্তা, দশটা ব্যালা, পথে যদি একটা বিপদ ঘটে? আমার স্বামীর ওপর ন-বৌয়ের বড় বিষদৃষ্টি।'

যোগীন কহিলেন, 'আর তুমিও ত পারো সামনে একখানা গণেশের ছবি টাঙিয়ে রাখতে, ঠাকুর দর্শন করে বেরোলে সব দোষ কেটে যায়।' বলিয়া দ্রুতপদে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

টুনি তাহার মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিয়া উঠিল 'ন-খুড়িমার মুখ সাক্ষেৎ অযাত্রা।'

'তুই থাম্ বাছা, মুখে বলে তুই আর দোষের ভাগী হোসনে।'—মেজগিন্নি তাহাকে থামাইয়া দিলেন।

উপরে বারান্দার একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রশান্ত সব শুনিল। শুনিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল, এবং আসিয়া হঠাৎ টুনির চুলের মুঠি ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া উঠানে টানিয়া আনিল। বলিল, 'তোকে কথা বল্‌তে কে বলেচে?'

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ক্রোধান্ধ প্রশান্ত ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েকটা চড় তাহার মুখ ও পিঠে বসাইয়া দিল। টুনির চীৎকারে সবাই আসিল ছুটিয়া। প্রশান্তর প্রহার সহজে থামিতে চাহিল না। মেজগিন্নি চেঁচামেচি করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়ী মাথায় তুলিলেন। সত্যবতী ছুটিয়া আসিয়া প্রবল শক্তিতে তাহার হাত হইতে টুনিকে ছিনাইয়া লইয়া কহিল, 'ছি ঠাকুরপো, তুমি কি শাসন করবার আর মানুষ পেলে না? চলে যাও এখান থেকে।'

প্রশান্ত বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

টুনির সহিত পাল্লা দিয়া মেজগিন্নি চীৎকার করিয়া ডুকরিয়া হাত-পা ছুড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বড়বউ পড়ি ত' মরি করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া সকলের মাঝখানে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'কি হলো রে ন-বৌ?'

সত্যবতী কহিল, 'ঠাকুরপো টুনিকে মেরেছেন।'

'কেন?'

'তা আমি জানিনে বড়দিদি।'

মেজগিন্নি ঝঙ্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'জানিস নে? মিথ্যেবাদী, তুই চোখ টিপে শিখিয়ে দিলিনি ছোট ঠাকুরপোকে—আমি কি চোখের মাথা খেয়েচি? বলিয়া তিনি এমন সব গ্রাম্যভাষা সত্যবতীর চরিত্র সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, তাহার সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা আর সম্ভব হইল না। পাড়ার লোক পর্যন্ত বাহিরের দরজার কাছে আসিয়া জড়ো হইয়া দেখিতেছিল। সে বড়বউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আপনি বিশ্বাস করুন বড়দি, মেজদিদির কথা সত্য নয়।' বলিয়া টুনিকে ছাড়িয়া দিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

মেজগিন্নির চীৎকার এবং কটূক্তি সকল লোক-লজ্জাকে অতিক্রম করিয়া বেপরোয়া চলিতে লাগিল। বড়বউ অতিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, 'আর কেন মেজবৌ, খুড়ো হয়, না-হয় দু'ঘা মেরেইচে।'

'দু'ঘা? তোমার পেটের মেয়ে নয় কিনা, তাই তুমি এমন করে দোষ ঢাকতে এসেচ। আজ বাড়ী আসুক, এস্‌পার কি ওস্‌পার—ন-বৌকে না তাড়িয়ে আমি জলগ্রহণ করব না।'

জলগ্রহণ ত তোমার বাসিমুখেই হয়ে গেছে মেজবৌ?' বলিয়া উত্যক্ত হইয়া বড়বউ উপরে উঠিয়া গেলেন।

বন্য পশু অকস্মাৎ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া যেমন সগর্জনে দাপাদাপি করিতে থাকে, মেজগিন্নি সমস্ত দিনটা ধরিয়া তেমনি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন। জলগ্রহণ তিনি আর সত্যই করিলেন না। স্বামীর আগমনের অপেক্ষায় রহিলেন। সত্যবতী একবার আসিয়া পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যে-জাতের মন্তব্য করিয়া তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন তাহা আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করা চলে না। চাকর-বাকরদের সম্মুখে অপমানে মাথা হেঁট করিয়া সত্যবতী চলিয়া গেল। বাস্তবিক, অপমানে-অপমানে তাহার আকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

যোগীন যথাসময় আসিয়া পৌঁছিলেন। কানের ভিতর দিয়া ক্ষীণ কথাগুলি তাঁহার মরমে পশিতে লাগিল। সকল বার্তা শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, 'বড়বৌ!'

বড়বউ নিকটেই ছিলেন, বলিলেন, 'নিজেদের ব্যবস্থা তোমরা নিজেরাই কর ঠাকুরপো, আমি ওতে নেই।'

'তুমি এ-বাড়ির গিন্নি, তোমাকেই এর হেস্তনেস্ত করতে হবে।'

'না—' বড়বউ কহিলেন, 'গিন্নি আজকাল আমি নই; গিন্নি এখন মেজবৌ, তার পরামর্শটাই তোমার বেশি দরকার।' বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

যোগীন ডাকিয়া পাঠাইলেন প্রশান্তকে, প্রশান্ত আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, টুনিকে মেরেচ তাতে আমার দুঃখ নেই প্রশান্ত, কিন্তু আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্চি একটা সামান্য স্ত্রীলোকের ইসারায় তুমি এতখানি উত্তেজিত হয়েছিলে। এ আমি তোমার কাছে আশা করিনি ভাই।'

প্রশান্ত মুখ তুলিয়া কহিল, 'আর কী বল্‌তে চান্‌?'

'আর কিছু নয়, এইমাত্র।' যোগীন তাহার দিকে তাকাইয়া পুনরায় কহিলেন, 'চিঠি ধরা পড়ার কথাটা বোধ করি এরই মধ্যে ভুলে যাওনি, সেই ন-বৌয়ের সম্বন্ধে তোমার এই অশোভন পক্ষপাতিত্ব সকলের চক্ষেই বিসদৃশ ঠেক্‌চে, প্রশান্ত।

প্রশান্ত কহিল, 'তার জন্যে আমি দুঃখিত মেজদা, কিন্তু তার কৈফিয়ৎ আমার নিজের মধ্যেই থাক্।' বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল তেমনি আবার চলিয়া গেল।

মেজবউ তখনো হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছিলেন। বলিলেন কী দুর্ভাগ্য করে তোমাদের ঘরে পড়েছিলুম, এ-বাড়ীতে অপমানের প্রতীকার নেই। অনেক লাথি এখনো আমার অদৃষ্টে আছে।'

উত্তেজিত হইবারই কথা। যোগীন কহিলেন, 'ন-বৌমার দম্ভকে আমি

নষ্ট করব তবে আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান। তিনি যেন মনে রাখেন তাঁর মাসোহারার বন্দোবস্তটা একদিন আমার হাতে হয়েছিল, আমি আবার ইচ্ছে করলেই··· থাক্, সে এখনকার কথা নয়' বলিয়া তিনি ভীষ্মদেবের মত মনে মনে কি একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া মুখ-হাত ধুইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রীও অতঃপর জলগ্রহণ করিবার জন্ত বাহির হইয়া আসিলেন।

*　　　　*　　　　*

একখানা চিঠি হাতে করিয়া প্রশান্ত কেদারবাবুর ঘরে সেদিন সকালে প্রবেশ করিল। কেদারবাবু মোটা একটা তাকিয়ায় হেলান্ দিয়া চোখ বুজিয়া ছিলেন; মাথায় তখনো তাঁহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। খাটের মেঝেয় বসিয়া বড়বউ ষ্টোভে স্বামীর জন্ত মোহনভোগ প্রস্তুত করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া তিনি কহিলেন 'কিরে ছোটু, চিঠি কিসের?'

প্রশান্তকে তিনি তাঁহার জন্মাবধি অতি স্নেহে কোলে পিঠে করিয়া বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রশান্ত শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, 'ডাক এসেছে বড়কর্তা।'

বড়বউ কহিলেন, 'ভেঙে বল্ বাছা, তোর কথা শুন্‌লে বুক কেমন করে ওঠে।'

কেদারবাবু ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া চাহিলেন। প্রশান্ত তাঁহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আজ আপনি কেমন আছেন বড়দা?'

'অনেকটা ভাল—' বলিয়া কেদারবাবু হাত বাড়াইয়া তাহার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া চোখের উপর ধরিলেন। অনেকক্ষণ তাহার উপর একান্ত দৃষ্টি বুলাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, 'ভাল চাকৃরি পেয়েচ, তবে ত আজকেই তোমাকে যেতে হবে দেখচি। পাটনার গাড়ী কখন?'

'সন্ধ্যার পরে,' প্রশান্ত কহিল।

কেদারবাবু আবার নীরবে চোখ বুজিয়া রহিলেন। বড়বউ কহিলেন, 'ওমা এর মধ্যেই? আজ তোর যাওয়া হবে না ছোটু। শৈল গেল শ্বশুরবাড়ী, নন্ত যায় ইস্কুলে, তুই গেলে চলবে কি করে?'

তাঁহার স্নেহের উক্তিগুলি এম্‌নি বে-হিসাবী পথ ধরিয়া চিরদিন চলে।

প্রশান্ত কহিল, 'না গেলে চাকৃরি থাকবে না যে।'

'না থাক্, চাকরি তোর কি হবে? বে-থা দিই, থাক্ এখানে বাছা; আমার দিন আর বাকি নেহ রে' বলিয়া তিনি দুই প্লেট ভাগ করিলেন। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কেদারবাবু কহিলেন, 'এই খাটে শুয়ে আমি অনেক দেখতে পাই প্রশান্ত, এই ক'টা দিন বড় কষ্টে তোমার এখানে কেটেচে।'

প্রশান্ত চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরায় কহিলেন, 'তোমার যোগ্য ব্যবহার তুমি এ বাড়ী থেকে পাওনি, অনেক দুঃখ তোমাকে সইতে হোলো। এ-বাড়ীর অনেকেই ভুলে যায় যে তুমি দূরের মানুষ।'

খাটের একান্তে বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া প্রশান্ত কহিল, 'তার জন্য আমি কিছু মনে করিনি বড়দা।'

'তুমি করনি কিন্তু আমার মনে গাঁথা রইলো—কেদারবাবু একটু থামিয়া কহিলেন, 'আমি জানি, এদের সঙ্গে তোমার কোনদিন মিলবে না, তবু আমার শেষের কথাটা শুনে যাও প্রশান্ত। এবারের মতো সামলে গেলাম বটে কিন্তু এর পরের ধাক্কা আর আমার সইবে না, সেদিন আমায় যেতেই হবে—'

প্রশান্ত কহিল, 'ও-কথা আর এখন বলবেন না বড়দা।'

'কেদারবাবু ক্ষীণ হাসি হাসিলেন। কহিলেন, 'সে দিনের জন্যে রইলে তুমি। বড়বউ আর ন-বৌমাকে সেদিন তোমার হাতে তুলে দিয়ে যাবো।'

দেখতে দেখতে বড়বউয়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। প্লেটে করিয়া মোহনভোগ তিনি দুই ভাইকে খাইতে দিলেন।

সমস্ত দিন ধরিয়া যাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল,—এবার প্রশান্ত চলিয়া যাইবে অনেক দিনের জন্য। পূজার ছুটিতে আসিতে পারে, নাও পারে। বড়বউ টাকা বাহির করিয়া দিলেন, ছোটখাটো সংসার পাতিবার

মতো জিনিষপত্র সে কিনিতে লাগিল। অন্যান্য বারে তাহার বিদেশ যাইবার সময় সত্যবতীই তাহার জিনিষপত্র গুছাইয়া দিত, মাথার দিব্য দিয়া চিঠি লিখিতে বলিত, বিছানা বাঁধিত, খাবার তৈরী করিত। অন্যান্য বারের সহিৎ এবারের অনেক তফাৎ। সমস্ত দিন ধরিয়া সত্যবতীর দেখাই পাওয়া গেল না। যে আপত্তিকর সংবাদ তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া রটানো হইয়াছে, তাহার পর যে-কোন ভদ্র-মহিলার পক্ষে জন-সমাজে মুখ দেখানো কঠিন। প্রশান্ত তাহাকে ডাকিল না, কোনো খোঁজ করিল না, কেবল নীরবে যাত্রার তোড়জোড় করিতে লাগিল।

সমস্ত দিন প্রখর রৌদ্রের পর বিকেলের দিকে আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেল। সূর্যাস্তের পূর্বেই দেখিতে দেখিতে পশ্চিম দিকে ঘন কালো মেঘ প্রবল হইয়া উঠিল। ধূলি ও জঞ্জাল উড়াইয়া ঝড়ের বাতাস বহিতে লাগিল। বড়বউ শঙ্কাকুল হইয়া একবার উপর হইতে নীচে এবং নীচে হইতে উপরে আনাগোনা করিতেছিলেন। অনেকবার তিনি প্রশান্তকে মানা করিলেন কিন্তু যাইতে প্রশান্তকে হইবেই, আগামী কাল পাটনায় তাহার হাজির হওয়া চাই-ই। তা ছাড়া, এখান হইতে ষ্টেশন্ পর্যন্ত পথটুকুই যা কষ্টকর, একবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে আর ভাবনা নাই।

মেঘে মেঘে দিক্‌দিগন্ত অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেছে। ঝড়ের উদ্দাম লীলায়, আকাশের বিদ্যুৎ-বহ্নিজ্বালায়, মেঘের গুরু গুরু গর্জনে, বিপ্লবী প্রলয়ঙ্কর আপন শিঙায় ফুৎকার দিয়া ডমরু বাজাইয়া দুরন্ত বেগে ধাবিত হইয়া আসিলেন; মুখে তাঁহার অট্ট অট্ট হাসির উল্লাস।

কানাই আসিয়া খবর দিল, ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতে একটু সময় ছিল তখনো। কানাই গিয়া গাড়ীতে জিনিষ পত্র তুলিয়া দিয়া আসিল। বড়বউ বোধ করি সদর দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন; প্রশান্ত দাদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিল।

'ঠাকুরপো—!' ছাদের সিঁড়ি দিয়া সত্যবতী ছুটিয়া নামিয়া আসিল।

'তোমাকেই খুঁজছিলাম বৌদি। এই ঝড়ে ছাতে ছিলে এতক্ষণ?' বলিয়া হেঁট হইয়া প্রশান্ত তাহার পায়ের ধুলা লইবার চেষ্টা করিতেই সত্যবতী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'আমাকে কোথায় রেখে যাচ্চ?'—তাহার দ্রুত নিশ্বাসের উত্থান-পতনের শব্দ শোনা যাইতেছিল।

ঝড়ের ধুলায় ও বালিতে তাহার সর্বাঙ্গ ধূসরিত, মাথার চুলগুলি বিপর্যস্ত। তাহার দীপ্ত ও তীব্র চক্ষুর দিকে তাকাইয়া প্রশান্তর মুখে কথা সরিল না।

'বল ঠাকুরপো, বল, তুমি আমায় কোথায় রেখে যাচ্চ?—'জোরে জোরে প্রশান্তর একটা হাত ধরিয়া নাড়া দিতে লাগিল।

'তুমি ত এখানেই রইলে বৌদি···বড়দা রইলেন—'

'না ঠাকুরপো, এখানে থাকলে আর আমার চল্‌বে না। আমি যাবো তোমার সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে? পাটনায়?'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে, এক্ষুনি, ঠাকুরের আদেশ হয়েচে—'

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশান্ত কিছুই অবিশ্বাস করিতে পারিল না। সত্যবতী অধীর হইয়া কহিল, 'আমাকে ফেলে যেয়ো না ঠাকুরপো, আমার আর কেউ নেই; আমার পথে তুমি আমাকে এগিয়ে দাও ভাই।'

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সত্যবতী ছুটিয়া গেল তাহার ঘরের ভিতর। জিনিষপত্র তোলপাড় করিল। থানচারেক কাপড় ও গোটা কয়েক তাহার আপন হাতের তৈরী জামা একত্র করিয়া পুঁটুলি বাঁধিল। ক্যাশবাক্সে ছিল কিছু টাকা, টাকাগুলি একখানা রুমালে বাঁধিয়া লইল। পরে একখানা চাদর গায়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া পুঁটলিটি কাঁকালে লইয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

প্রস্তরমূর্তির মত প্রশান্ত নিশ্চল হইয়া সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া কি-যেন গভীর চিন্তা করিতেছিল! সত্যবতী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আগে আগে নামিয়া গিয়া কহিল, 'এসো ঠাকুরপো।'

প্রবল বেগে বাহিরে তখন বৃষ্টি নামিয়া আসিয়াছে। বড়বউ জলের ছাট বাঁচাইয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। সত্যবতী আসিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল আমিও যাচ্ছি বড়দি ঠাকুরপোর সঙ্গে।'

'ওমা!' বড়বউ বাহিরের দুর্যোগের দিকে তাকাইয়া ও সত্যবতীর চেহারা দেখিয়া চক্ষু কপালে তুলিলেন—'ছোটু যাচ্ছে চাকুরিতে, তুই যাবি কোথায় তা সঙ্গে ন-বৌ? এই ঝড়-বৃষ্টি···অসময়···কর্তাকে বলে এসেচিস?'

'না, তাঁর কাছে আর এ-মুখ দেখাবো না বড়দি—'বলিয়া ঝড়-বৃষ্টি বজ্রপাত ও অন্ধকারের মধ্যে সত্যবতী গিয়া মোটরে উঠিয়া পুনরায় কহিল,'এসো ঠাকুরপো আর সময় নেই।'

প্রশান্ত অগত্যা নিরুপায় হইয়া বিদায় লইয়া গিয়া উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়ীর অন্দরমহল তুমুল হইয়া উঠিল। সত্যবতীর চলিয়া যাওয়াটা এতই আকস্মিক ও বিচিত্র যে, সে-কথা ভাবিতেই খানিকক্ষণ সকলের সময় চলিয়া গেল। বড়বউ ছুটিয়া গিয়া কেদারবাবুকে খবর দিলেন। যোগীন ও বিপিন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। ইন্দুবালা জানালাটা খুলিয়া দিয়া অবাক হইয়া পথের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার দিকে তাকাইয়া রহিল। ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করিয়া কলরব করিতেছে। চাকর-বাকরেরা বসাইল মজলিস।

কেদারবাবু লাঠি ধরিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিয়া একখানা ইজি-চেয়ারে বসিলেন। অদূরে বসিয়াছিল তাঁহার আর দুইটি ভাই। তাঁহাদের দিকে একবার তাকাইয়া তিনি স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'বেশ ত বড়বৌ, কান্না কেন,—অনেক সহ্য তিনি করেছেন, কিছুদিন বেড়িয়ে আসুন, বীরেন গিয়ে একসময় নিয়ে এলেই হবে।'

'এমন করে যাওয়া কি ভাল হয়েচে তার প্রশান্তরসঙ্গে? লোকে যে এরপর প্রশান্তর চরিত্র সম্বন্ধে—'

'প্রশান্তর সঙ্গে ত তিনি যান্‌নি যোগীন, শ্রীবিষ্ণু নিয়ে গেচেন তাঁর হাতে ধরে।'—শীর্ণ হাসিয়া কেদারবাবু করযোড়ে উপর দিকে তাকাইয়া একটি প্রণাম নিবেদন করিলেন। মুখে তাঁহার অনির্বাচনীয় স্নেহচ্ছায়া !

৬

পথে ঝড় বৃষ্টি ও দুর্যোগের ভিতর দিয়া মোটর আসিয়া হাওড়া ষ্টেশনে থামিল।

গাড়ী ছাড়িবার সময় আর বেশি বাকি নাই। মোটরের ভাড়া চুকাইয়া কুলির মাথায় জিনিষপত্র চাপাইয়া টিকিট করিয়া প্রশান্ত ও সত্যবতী দ্রুতপদে প্লাটফরমের দিকে চলিল। ইঞ্জিন আসিয়া তখন গাড়ীর সঙ্গে লাগিযাছে।

খুঁজিতে খুঁজিতে সুমুখের দিকে একখানা নিরিবিলি ইণ্টার ক্লাস কামরা তাহারা আবিষ্কার করিল। কাম্‌রাটি নিতান্ত ছোট নয়, যাত্রীও মাত্র দু'চার জন। অতএব সেই কাম্‌রাতেই উঠিয়া তাহারা মুখোমুখি দুইখানি বেঞ্চি দখল করিয়া বসিল। সত্যবতী এতক্ষণের মধ্যে সামান্য দু'একটি কথা বলিয়াছে মাত্র, তাহার মুখের দিকে তাকাইতে প্রশান্তর কেমন যেন সাহস হইতেছিল না। জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করিয়া নিজেকে ব্যস্ত রাখিয়া সে জানাইবার চেষ্টা করিল যে, সে এখনো ভাল করিয়া কথা বলিবার সময় পায় নাই।

বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ছাড়িবার মুখে জানালা দিয়া সে মুখ বাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু বৃষ্টির জলের ছাটে কোথাও কিছু দেখিবার উপায় নাই, সুতরাং নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে শান্ত ভাবে বসিতে হইল। সত্যবতী জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিল।

'ছাট্ আসচে, জানালাটা বন্ধ করে দেবো বৌদি?'

মুখ ফিরাইয়া ঘাড় নাড়িয়া সত্যবতী কহিল, 'দাও।'

কিন্তু মুখ ফিরাইতেই প্রশান্ত মনে মনে বিস্মিত হইয়া গেল। আজ পর্যন্ত সে তাহার এই বৌদিদির চোখে একবিন্দু অশ্রু দেখে নাই,—কত আঘাত কত অসম্মান ও কত অন্যায় অবাধে তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু আজ তাহার চক্ষের দর-দর জলধারা দেখিয়া হতচকিত প্রশান্ত কোনো প্রশ্নও করিতে পারিল না, কেবল নিঃশব্দে উঠিয়া জানালার কাচের শাসিটা তুলিয়া দিল।

নিজের জায়গায় আসিয়া বসিতেই সত্যবতী চাদরের খুঁট দিয়া চোখ মুছিয়া প্রশ্ন করিল, 'তোমার কি মনে হয় ঠাকুরপো, আমি কিছু অন্যায় করে এলাম?'

গলার আওয়াজ শুনিয়া প্রশান্ত এতক্ষণে একটু স্বস্তি বোধ করিল। মনে হইল, বৌদিদির ভিতরের উত্তেজনাটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। কহিল, 'বলা কঠিন বৌদি। আজ অবধি তোমাকে যারা জান্‌লে না তারা দেখবে তোমার আগাগোড়াই অন্যায়। মানুষ হাঁটে তার নিজের পথে এ-কথা আমরা ভুলে যাই।'

দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। গাড়ীর গতি দ্রুততর হইয়াছে, চাকায় চাকায় লোহার ঘর্ষণে অবিশ্রান্ত আর্তনাদ কানে বাজিতেছিল। প্রশান্ত কহিল, 'তোমার আসবার কোনো আয়োজন ছিল না। কিন্তু আগে জানলে আমি সব ব্যবস্থা করে রাখতুম বৌদি।'

'এই ভাল ঠাকুরপো—সত্যবতী কহিল, 'আয়োজনের সঙ্গে আসত বাধা-নিষেধ; হঠাৎ চলে আসাটাই হয়েচে ন্যায্য বিচার! আমি নিজেকে একেবারে ছিঁড়ে এনেচি। যেদিন শুনলাম বড়ঠাকুর ভাল আছেন, আর ভয় নেই,—সেইদিন আমার মনে হয়েছিল আর আমার এখানে থাকা চলে না। তিনদিন অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়িয়েচি, চোখে আমার নিয়মিত ঘুম নেই, মনের মধ্যে

কি ঘটনা যে ঘটছিল তা বুঝতে পারিনি,—সে যে কী অস্বস্তি, আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। এমনি করে সব ছেড়ে চলে আসবার ভয়ানক ইচ্ছাটাকে নিজের মধ্যে বারবার দমন করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার বুকের ভিতরে বসে কে যেন আমার একটা অজানা সঙ্কল্পকে অটল করে গড়ে তুল্‌ছিল, আমি তাকে বাধা দিতে পারিনি ঠাকুরপো।'

প্রশান্ত কহিল, 'তোমার কথা বুঝতে পারলুম না বৌদিদি।'

সত্যবতী এক বিচিত্র হাসি হাসিয়া কহিল, 'বুঝতে সবটা আমিও পারিনি ভাই, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার কথার মধ্যে কোথাও মিথ্যা নেই। যখন অবেলায় উঠ্‌ল ঝড়, যখন ডেকে উঠ্‌ল কালো মেঘ, বিদ্যুৎ আর বাজপড়ার শব্দে যখন শ্রীবিষ্ণুর দরজা পর্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ল—আমি শুনলাম বাঁশীর আওয়াজ। বিদ্যুতের আলোয় ঠাকুর আমাকে দেখালেন আমার নিজের পথ। ঠাকুরপো তুমি না এলেও আমাকে আসতে হোতো,—হয় আজ, নয় কাল, নয়ত পরশু।'

'একা? একা কোথায় যেতে বৌদি?'

'একাই যেতাম ভাই—' সত্যবতী সুমুখের জানালার দিকে তাকাইয়া কহিল, 'আমার পথ একা যাবারই পথ। কেবল যে সে পথে বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই তা নয়, সে পথ কাঁটায় ভরা, দুর্যোগে দুর্গম, কলঙ্কে অভিশাপে ও শত্রুতায় ভয়ঙ্কর।'

প্রশান্ত কহিল, 'তুমি কি বলতে চাও বৌদি, আমার সঙ্গে পাটনায় যাবে না?'

'না ঠাকুরপো, পাট্‌নায় ত আমি যাচ্ছিনে?'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রশান্ত তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, বড়দা কিন্তু জেনে রাখলেন তুমি আমার ওখানেই যাচ্ছ।'

সত্যবতী হাসিয়া কহিল, 'আমি তোমার ওখানে কেন যাইনি এ কথার উত্তরও বড়ঠাকুর একদিন পেয়ে যাবেন ভাই।'

প্রশান্ত মাথা হেট করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কি-যেন চিন্তা করিল। ট্রেন

আসিয়া একটা ষ্টেশনে থামিল, যাত্রী উঠা-নামা করিল, ফিরিওয়ালারা দল বাঁধিয়া হাঁকিয়া গেল, তারপর আবার ফ্ল্যাগ উড়াইয়া বাঁশী বাজাইয়া এক সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল,—প্রশান্তর চোখে এ সকল কিছুই পড়িল না। পড়িবার কথাও নয়, যে-সত্যবতীকে সে চিনিয়া রাখিয়াছে এ তাহার আমূল পরিবর্তিত রূপ। তাহার সকল কথার পিছনে যে রহস্যময় ইঙ্গিতটি ফুটিয়া উঠিতেছিল, সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের নারীর জীবনে তাহার চেহারা যে কী ভয়াবহ তাহা অনুভব করিয়া এই চিরদ্রোহী দুঃসাহসীর বুকের ভিতরেও কাঁপিয়া উঠিল। এই-যে প্রেরণা, এই যে আবেগ, নিজেকে দুঃখ-দহনের মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া এই-যে আত্মপ্রকাশ করিবার অধীর কামনা, ইহার মূল্য স্বীকার করিয়া লইতে সে জানে, ইহা হৃদয় দিয়া বুঝিবার মতো বিবেচনা সে আবাল্য শিক্ষার ভিতর হইতেই সংগ্রহ করিয়াছে,—কিন্তু ইহার আর একটা দিক? সেদিকে তো কোথাও স্নেহের ছায়া নাই, মেঘের মায়া নাই, সেদিকে যে পদে-পদে পথে-পথে উৎপীড়ন, নীতিবুদ্ধির মার্জনাহীন অনুশাসন। এই যে ভদ্রচিত্ত, পরিচ্ছন্ন রুচি, সুমার্জিত বুদ্ধি, উদার ও অমলিনহৃদয়া নারীটি,—প্রত্যহ-জীবনের খরকণ্টক ও দুর্দশায় অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনকে সে কি আপন শক্তিকে রোধ করিতে পারিবে? অথচ প্রশ্ন করিয়া সকল কথা জানিবার মতো সাহসও প্রশান্তর ছিল না। কোনো বাধা, কোনো বিধি ও নিষেধ সম্মুখে আনিয়া ইহার এই যাত্রাকে বিরত করিতেও তাহার শক্তিতে কুলাইল না। যেখানে আছে শ্রদ্ধা ও সম্মান,—সেখানে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া উপদেশ দেওয়া নিতান্তই অবিনয়।

জল-ঝড় থামিয়া ইতিমধ্যে আকাশ কখন পরিচ্ছন্ন হইয়া গেছে, কখন্ আসিয়া স্বপ্নজাল রচনা করিয়াছে ক্ষীণ চন্দ্রকলার সহিত নক্ষত্রের দল, কখন্ যাত্রীদলের কোলাহল থামিয়া তাহাদের চোখে নামিয়াছে তন্দ্রা তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এক ঝলক বাহিরের বাতাস মুখে-চোখে লাগিয়া তাহার চমক ভাঙিয়া দিল। মুখ তুলিয়া সে দেখিল, ইহারই মধ্যে কোন্ সময়

কাচের শার্সিটা নামাইয়া দিয়া সত্যবতী বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

'আমি যদি তোমাকে আজ বুঝতে না পারি তবে আমাকে ক্ষমা ক'রো বৌদি।'

সত্যবতী মুখ ফিরাইল। মুখ ফিরাইয়া স্নেহের হাসি হাসিল। প্রশান্ত কহিল, 'দু'জনে একসঙ্গে আসার একটা দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বটাই আমাকে পীড়া দিচ্চে বৌদি। সবাই জান্‌ল আমি তোমার সঙ্গী, কিন্তু একদিন যখন তারা জান্‌তে পার্‌বে তুমি নিরুদ্দেশ হয়ে চলে গেচ, আমি জানিনে তোমার খোঁজ-খবর, সেদিন আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। তোমাকে বাধা দেবার, তোমাকে উপদেশ দিয়ে থামিয়ে রাখার সাধ্য যে আমার নেই একথা তারা বিশ্বাস করতে চাইবে না।'

অনেকক্ষণ ধরিয়া সত্যবতী চিন্তা করিল, তারপর বাঁ-হাতে কপালের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া কহিল, 'সে দায় থেকে তোমাকে আমি বাঁচিয়ে যাবো ঠাকুরপো। যাঁকে আমি সকলের চেয়ে শ্রদ্ধা ও মান্য করি সেই বড়ঠাকুরকে নির্ভয়ে আমি একখানি চিঠি লিখ্‌ব, খুলে বলব আমার সকল কথা, জানি তিনি আমায় সমস্ত মন দিয়ে ক্ষমা করবেন।'

'কিন্তু তোমার নিজের কথা ত বললে না বৌদি? এ কথা—আমি তোমার এই যাওয়ার পিছনে যে-কথাটা রয়েচে কেমন করে বিশ্বাস করবো সে-কথাটা অতি সাধারণ, অতি পুরোনো—তার চেহারাটা সকলেরই অল্প-বিস্তর পরিচিত।'

সত্যবতী আবার হাসিল। বলিল, 'ঠাকুরপো, এ কেবলমাত্র কথা নয় এটা জেনে রেখো। আমার এই যাত্রা হৃদয়াবেগের নয়, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের নয়, কোনো দম্ভ ও বাহাদুরির প্রকাশও নয়,—এই গতিই আমার পক্ষে স্বাভাবিক।'

'কিন্তু এর কলঙ্ক?'

'কলঙ্কের আর কী বাকি আছে বল ত? তুমি ত দেখেচ সামান্য একখানা

চিঠির জন্যে আমার সুনাম খ্যাতি, প্রতিপত্তি কেমন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল! অথচ ও-চিঠির মধ্যে আমি পাপের চেহারা দেখতে পাইনে; পূজার উপকরণ দিয়ে সাজালুম দেবতার অর্ঘ, সে আমার পাপ নয়। তোমরা বললে আমার সব মিথ্যে। আমার ধর্ম কর্ম ত্যাগ সংযম, আমার যা কিছু ভালো তোমাদের চোখে পড়েছিল, সব মিথ্যে, সব আমার ছদ্মবেশ। সেদিন খুশী হয়ে বললাম, ভগবান সবই যেন আমার মিথ্যে হয়ে যায়, আমার সত্য পরিচয় যেন একদিন জ্যোতির্ময় হয়ে জেগে ওঠে নবজীবনের প্রভাতে। তাই হোলো ঠাকুরপো, তাই হোলো। সূর্যমুখী বসেছিল সূর্য-কিরণের পথ চেয়ে, তার পাবার বস্তু সে পেয়ে গেল। যা ছিল কলঙ্ক তা হলো চন্দন।'

প্রশান্ত তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে পুনরায় কহিল, 'তোমাদের অপমান আমি মাথা পেতে নিলাম কিন্তু আমার কি কিছুই বলবার নেই? তোমাদের বিশ্বাসের মূলে আমি কুঠারাঘাত করেছি, চরিত্রহীন বলে আমাকে তোমরা দূরে সরিয়ে দিলে কিন্তু তোমাদের ঘরগড়া নিয়মের নামে আমি ত আমার ধর্মকে পায়ে ঠেল্‌তে পারিনে। ঠাকুরপো, আমি চেয়েছি বাঁচতে। সে বাঁচা কেবল পাল-পার্বণ, ব্রত-উপবাস, ত্যাগ-সংযম, ঠাকুর-ঘর, রান্নাঘর নিয়ে বাঁচা নয়, মেয়েমানুষের বেঁচে থাকার আরো পথ রয়েছে যে। নিজেকে বঞ্চিত করাটা ত্যাগ হতে পারে কিন্তু সংযম নয়; সকল দরজা খুলে শত ধারায় নিজেকে ছড়িয়ে আমি বাঁচতে চাই।'

রাত্রি গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। দ্রুতগতির দোলায় গাড়ীখানা ওলটপালট করিয়া দুলিতেছে। পাশের ও দূরের বেঞ্চিগুলিতে যাত্রীরা অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুম কেবল তাদেরই চক্ষে নাই। প্রশান্ত বাহিরের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিল। জল, জলাশয়, প্রান্তর, বন-জঙ্গল ছায়াচিত্রের মতো তাহার দৃষ্টির উপর দিয়া সরিয়া যাইতেছিল! দূর প্রান্তরে কোথাও কোথাও আলোর রেখা এক একবার দেখা দিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল—তাহা আলেয়ার আলো, কিম্বা জোনাকি, কিম্বা কোনো গ্রাম্যগৃহের স্তিমিত প্রদীপশিখা তাহা বিবেচনা করিয়া

বুঝিবার মতো মনের অবস্থা তাহার নয়। উপরের পরিচ্ছন্ন আকাশে নক্ষত্রবালারা চন্দ্রের চারিপাশে আসন পাতিয়া ধ্যানে বসিয়াছে। সেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার দিকে তাকাইয়া প্রশান্তর প্রথমেই মনে হইল, দিনের প্রখর আলোয় ও বাস্তবিকতায় সত্যবতীর কথাগুলির হয়ত তীব্র সমালোচনা করা যাইত, হয়ত তাহার এই সমাজদ্রোহিতাকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা চলিত; কিন্তু এই রাত্রির নীববতায় ওই নির্জন প্রান্তরের জ্যোৎস্নার আলোছায়ায় ট্রেনের এই দ্রুতগতির মধ্যে,—কোথাও তাহাকে আর বিশ্বাস ও সন্দেহ করিবার পথ নাই। তাহার সকল উক্তি ও তর্কের ভিতরে ছিল একটি সতেজ ও সাবলীল প্রাণধারা, উপলব্ধ সত্যেব একটি প্রখব আলো। উত্তেজনা নাই, জ্বালা নাই, অস্থায়ী হৃদয়াবেগের রঙে রঙীন নয়,—এ তাহার আত্মার বাণী, তপস্যালব্ধ আত্মচেতনা।

'আর আমাব ভয় নেই ঠাকুরপো—' সত্যবতী বলিতে লাগিল, 'আসুক বিপদ, আসুক ঝড়, দশ দিকে প্রবল হয়ে উঠুক শত্রুতা, আকণ্ঠ হযে উঠুক নিন্দা আর কলঙ্ক, আমি চলে যাবো আমার পথ চিনে চিনে। এবার আমি পেযেচি আমার দুর্লভকে, পেযেচি দেবতার বাণী, আলোয় আলো হয়ে উঠেচে আমার চারিদিক, ফুলের মধ্যে অসহনীয় ব্যথা জেগে উঠেচে ফল ধারণের,—আর আমার কোন ভয় নেই। পাহাডের চুড়ায় ছিল অবরুদ্ধ বন্যা, এবার সে পাথরের আগল ভেঙে নেমে এল, তার স্বভাবের গতিতে বাধা দেবার সাধ্য মানুষের নেই, সে ছুট্‌বে তার পথে, ঝাঁপ দেবে সাগরের গর্ভে। এর পিছনে রযেচে আমার সত্যধর্মের প্রেরণা, মনুষ্যত্বের সঙ্কেত।'

প্রশান্ত আর পারিল না, তাহার হাতখানি জোরে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'বল তুমি বৌদি, কোথায় যাবে এখন?'

সত্যবতী কহিল, 'এলাহাবাদে।'

প্রশান্ত তেমনি করিয়াই তাহার হাত ধরিয়া কহিল, 'এলাহাবাদের প্রয়োজন কী তোমার জীবনে? সংসার থেকে একদিন তুমি ত সবই পেয়েছিলে। ভালবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, সম্মান, রাজত্ব—কিসের অভাব ছিল তোমার? মানুষের

সমাজের এই অপরিমিত ঐশ্বর্য ছেড়ে কোন্ এক সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবনের দিকে কেন চলেচ? এ কথা আমি কেমন করে ভাববো যে তুমি আজ চাও সামান্য প্রেম, তুচ্ছ সম্ভোগ, অস্থায়ী তৃপ্তি, কেমন করে আজ মেনে নেবো যে তুমি সামান্য নারী?'

'সামান্যই নারী আমি—' সত্যবতী বলিল, 'অসামান্য হয়ে উঠেছিলাম অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে। কিন্তু একথা আমি আজ তোমাকে কেমন করে বোঝাবো ঠাকুরপো নিরেনব্বইটা মেয়ের মতো আমি ভালবাসার কাঙাল নই, আমি ঘৃণা করি কুৎসিত দেহ-সম্ভোগ, অসংযত শারীরিক আনন্দ। আমার জীবন-আদর্শের মধ্যে কোথাও তার ঠাঁই নেই।'—তাহার গলায় রুদ্রাক্ষের মালার সোনার চেনটা গাড়ীর আলোয় ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল, বাঁ-হাতে তাহারই উপর সুন্দর ও সুকোমল আঙুলগুলি বুলাইয়া সে পুনরায় বলিল, 'তোমার জিজ্ঞাসু মন কেবলই আমার কথায় আহত হচ্চে, কেবলই তুমি ভাবচ আমার পরিণাম, কিন্তু এই শেষ কথাটা বলে তোমার কাছে বিদায় নিই, আমার এ পথ অভিসারের পথ নয়, আমি ছুটচিনে পুরুষের প্রেমের পিছনে, মেয়েমানুষের বিরহ-মিলনের সুলভ ও সাধারণ আনন্দ-বেদনায় আমার মন দুলে ওঠেনি, আমার সাধ নেই তোমাদের শত্রুতা করার, আমার চেষ্টা নেই সমাজ-সংস্কারের, ধ্বংস ও বিপ্লব আমার কাম্য নয়,—ঠাকুরপো, আমি চাই মানুষের সেবা করতে।'

'সেবা? সে-কাজ ত তোমার আগেও ছিল?'

সত্যবতী হাসিল। হাসিয়া বলিতে লাগিল, 'আগেও ছিল না, এখনো নেই। আমি খুঁজে নেবো সেই সেবার পথ।'

প্রশান্ত তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। কহিল, 'তোমার সেবা এত সুলভ নয় বৌদি; যে-কাজ একজন সাধারণ মেট্রন-এর সে-কাজে তোমার কোনো বিশিষ্ট গৌরব নেই। সেবাই যদি করতে চেয়েছিলে তবে সে ত সংসারেই সম্ভব ছিল বৌদি।'

'ঠাকুরপো, যদি কিছু কঠিন শোনায় তবে ক্ষমা ক'রো—' সত্যবতী কহিল 'সেবা আর দাসত্ব এক জিনিষ নয়!'

'দাসত্ব তুমি ত করনি, তোমার আসন ছিল অনেক উঁচুতে বৌদি।'

'ভুল করচ তুমি, আসন সত্যি থাক্‌লে সে-আসন নষ্ট হতো না। পৃথিবীতে কোনো বস্তুই অবারিত চলে না, একদিন আসে তার অগ্নি-পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় যত মিথ্যা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমার উঁচু আসনের নীচে ছিল সম্পত্তিবোধের দাবি, শ্রদ্ধার নীচে ছিল অধিকারের গোপন দম্ভ। তাকে আমি সেবা বলিনে।'

প্রশান্ত নত মস্তকে নীরবে বসিয়া রহিল। রাত আর বাকি নাই, অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া সহজেই বুঝিতে পারা গেল, এইবার উষার কণকরেখা দেখা দিবে। প্রত্যূষে গাড়ী পৌঁছিবে পাট্‌না ষ্টেশনে। আর মাত্র এইটুকু সময়, তারপরেই তাহাদের পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ বধূটিকে এবারের মতো বিদায় দিতে হইবে, হয়ত এই বিদায় চিরদিনের মতোই, জীবনের কোনো ঘাটেই আর দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি নিবিড় বেদনায় ভারি হইয়া আসিল কিন্তু চুপ করিয়াই তাহাকে থাকিতে হইল, কথা বলিবার আর কোনো পথ নাই; তাহার সংশয়ী মন একটি একটি করিয়া অনেক প্রশ্নের উত্তরই পাইয়া গিয়াছে।

কত ষ্টেশনে কতবার গাড়ী থামিয়াছে, পার হইয়া আসিয়াছে কত জনপদ, কত দেশ-দেশান্তর,—তবু তাহাদের হুঁস ছিল না।

প্রশান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'তুমি যাকে গ্রহণ করবে, যার সেবা করবে তিনি কত বড় সেই কথাটাই চিরদিন মনে মনে ভাববো,—কিন্তু তুমি বলে যাও বৌদি, আবার কবে তোমায় দেখবো।'

'সে ত তোমারই হাতে ঠাকুরপো—' সত্যবতী কহিল, 'তুমি যেদিন আমাকে ডাক্‌বে সেদিন ত আর দূরে থাকতে পারব না, সেদিন আমাকে আসতেই হবে।

প্রশান্ত কহিল, 'এই যেন তোমার মনে থাকে বৌদি, আমার কাছে রইল তোমার অবারিত অধিকার। দুঃখে-দুর্দিনে এই ছোট ভাইটিকে তুমি স্মরণ

ক'রো। সংসারের সকল দরজায় ঘা দিয়ে তোমাকে হেঁট মুখে ফিরে আসতে হয়, আমার মন্দিরে পাতা রইল তোমার সিংহাসন!—তবু একটা কথার উত্তর দিয়ে আমার শেষ সন্দেহটা দূর করে' যাও বৌদি' সত্যবতী তাহার মুখের দিকে তাকাইল। দিগন্তে তখন ভোরের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রশান্ত কহিল, 'যার সেবা করতে চলেচ তাঁর কাছে কি তোমার কোনো দাবিই নেই?'

সত্যবতী ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'আছে ঠাকুরপো, আছে। শুধু দাবিই জানাতে যাচ্চি। যার সেবার জন্ম আমি লালায়িত হয়ে ছুটচি সে এখনো দিনের আলোয় এসে পৌছয়নি, কিন্তু তাকে আসতেই হবে, তাকে আন্‌বার দাবিই জানাতে যাচ্চি।'

প্রশান্ত বড় বড় চোখে তাহার দিকে তাকাইতেই সে পুনরায় কহিল, আশ্চর্য হয়ো না, আমি স্ত্রীলোক, আমি মেয়ে—"বলিতে বলিতেই উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠ উচ্চে উঠিল, 'ঠাকুরপো, জীবনকে আমি ব্যর্থ হতে দেবো না, ব্যর্থ হতে দেবো না আমার দেহের এই প্রাচুর্যকে। প্রেম আমার কাম্য নয়, আমি চাই তার পরিণতি; তোমাকে কেমন করে' বোঝাবো আমার ক্ষুধার চেহারাটা কেমন, আমার দিবারাত্রির অন্তর্দাহ কী ভয়ঙ্কর। এই পৃথিবীতে একদিন আমার জন্ম হয়েছিল নারীর সব শ্রেষ্ঠ পরিচয় দেবার জন্যে, কিন্তু তার পথ রুদ্ধ করে দিল মৃত্যু। আমার পূজনীয় স্বর্গগত স্বামীর কাছে পেলাম ভালবাসা কিন্তু তার চেয়েও যা বড়, আমার সেই মাতৃত্বের উদ্বোধন করবার সময় আমি পেলাম না।'

'কী বলতে চাও বৌদি?'

'বলতে চাই আমি কেবল নারী নই, আমি মা, মা,—বাৎসল্যের রসে সিক্ত হয়ে উঠেচে আমার সমস্ত মন, পলাশ-অশোক আর শিমুলের লালে রাঙা হয়ে উঠেছে আমার সর্বদেহ, রক্তে রক্তে জেগেচে নিবিড় বাৎসল্যের আন্দোলন। ঠাকুরপো এবার আমি চাই সন্তান!

'সন্তান!'

অনির্বচনীয় উচ্ছ্বাসে সত্যবতীর চক্ষু বুজিয়া আসিয়াছিল, নিশ্বাসের দ্রুত আনাগোনায় সে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। কহিল, সন্তান,—রক্ত মাংস প্রাণময় সন্তান, অসহনীয় যন্ত্রণায় অবর্ণনীয় ক্লেশে কোল জোড়া করে পাবো যে শিশু-দেবতাকে, সেই সন্তানের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করব আমার জীবনকে, সেই হবে আমার সর্বোত্তম বাণী। সে আসুক, সবাই করুক তার জয়ধ্বনি, আমার এই দেহের নির্জন কুটীরে বসে কাঙালিনী মা সন্তানের আশায় প্রদীপ ধরে বসে রয়েচে, সে এসে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। সে সৃষ্টি করবে এক মহাজাতি, নূতন সমাজ, নব ধর্ম, আদর্শ জীবন। সে প্রচার করবে কল্যাণের বাণী, দান করবে অমৃত, সৃজন করবে বিচিত্র স্বর্গলোক। আমার ক্লেদক্লিন্ন জীবনের বৃন্তে সেই শিশু শতদলের মতো ফুটে উঠুক, তার পরে নেমে আসুক দিন-দেবতার জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ—আমার প্রাণের রসে তাকে সঞ্জীবিত করে আমি ধন্য হবো, তার সেবা করে আমি সার্থক হবো। তুমি এই কামনা করো ঠাকুরপো, যাঁর কাছে চলেচি তিনি যেন এমনি একটি সন্তান আমাকে ভিক্ষা দেন, আমার সব মিথ্যা হয়ে থাক, স্বপ্ন যেন আমার সত্য হয়।' বলিতে বলিতে অধীর আবেগে সত্যবতীর উদ্দীপ্ত মুখখানি অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

প্রত্যূষের আলোয় পাটনা ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামিল। কুলি আসিয়া দাঁড়াইতেই প্রশান্ত ইঙ্গিত করিয়া তাহার জিনিষপত্রগুলি দেখাইয়া দিল—ছোট স্যুট্‌কেশ্‌টি রাখিয়া গেল সত্যবতীর জন্য। কথা আর সে একটিও কহিল না, জিনিষপত্র নামাইয়া দিয়া হেঁট হইয়া নিঃশব্দে সে গাড়ী হইতে নামিয়া গেল।

তাহার পথের দিকে তাকাইয়া নীরবে আশীর্বাদ করিয়া সত্যবতী প্রভাত-সূর্যের দিকে ফিরিয়া যুক্তকরে কেবল একটী প্রণাম করিল।

সমাপ্ত

